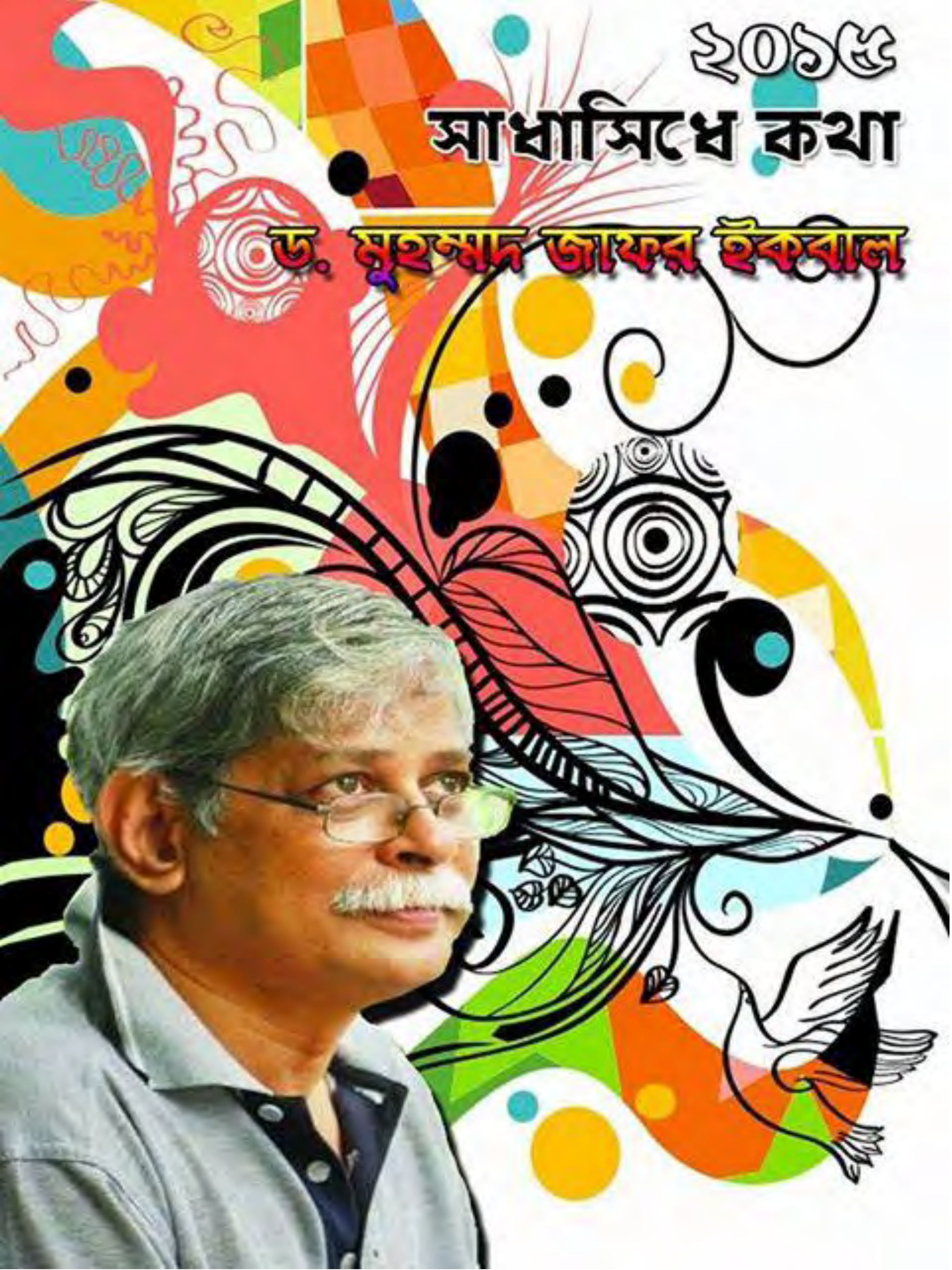
২০১৫
সাধাসিধে কথা
ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সাদাসিধে কথা
মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

প্রকাশ কালঃ ২০ জানুয়ারি, ২০১৫ ইং
প্রকাশনায়ঃ সেঁজুতি পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদঃ আতিকুর রহমান
অঙ্গসজ্জাঃ ফরহাদ আহমদ নিলয়

লেখক পরিচিতি (উইকিপিডিয়া অবলম্বনে)

মুহম্মদ জাফর ইকবাল (জন্ম ডিসেম্বর ২৩, ১৯৫২ ইং) একজন বাংলাদেশী লেখক, পদার্থবিদ ও শিক্ষাবিদ। তিনি বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখা ও জনপ্রিয় করণের পথিকৃত। এছাড়াও তিনি একজন জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক এবং কলাম-লেখক। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তিনি বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং তড়িৎ কৌশল বিভাগের প্রধান।

একটি জরিপের তথ্য অনুসারে, তিনি বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে লেখক হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। জরিপে ৪৫০ জনের মধ্যে ২৩৫ জনই (৫২.২২%) তাঁর পক্ষে মত দিয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনঃ

জাফর ইকবালের জন্ম ডিসেম্বর ২৩, ১৯৫২, সিলেট । তাঁর পিতা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন। বাবা ফয়জুর রহমান আহমদের পুলিশের চাকরির সুবাদে তার ছোটবেলা কেটেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। মুহম্মদ জাফর ইকবালের নাম আগে ছিল বাবুল। পিতা লেখালেখির চর্চা করতেন এবং পরিবারের এই সাহিত্যমনস্ক আবহাওয়ায় জাফর ইকবাল খুব অল্প বয়স থেকেই লিখতে শুরু করেন। এটিকেই তিনি তার সহজ ভাষায় লিখতে পারার গুণের কারণ বলে মনে করেন। তিনি তার প্রথম বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখেন সাত বছর বয়সে। ১৯৭১ সালের ৫ মে পাকিস্তানী আর্মি এক নদীর ধারে তার দেশপ্রেমিক পিতাকে গুলি করে হত্যা করে। বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া জাফর ইকবালকে পিতার কবর খুঁড়ে তার মাকে স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারটি বিশ্বাস করাতে হয়েছিল। আমেরিকাতে পড়ার সময় তিনি তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ইয়াসমিন হকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ড. ইয়াসমিন হক শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি আমেরিকা ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর দুই সন্তান - বড় ছেলে নাবিল ইকবাল যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে স্নাতক সম্পন্ন করে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি করছেন এবং কন্যা ইয়েশিম ইকবাল কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্পন্ন করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে পিএইচডি করছেন। ইয়েশিম ইকবাল তার কিশোর উপন্যাস *আমার বন্ধু রাশেদ* ইংরেজিতে রূপান্তর করেছেন *Rashed, my friend* নামে । বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ তার বড় ভাই এবং রম্য ম্যাগাজিন উন্মাদের সম্পাদক ও কার্টুনিস্ট, সাহিত্যিক আহসান হাবীব তার ছোট ভাই।

শিক্ষাজীবনঃ

জাফর ইকবাল ১৯৬৮ সালে বগুড়া জিলা স্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৭০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। তাঁর বিষয় ছিল - **Parity violation in Hydrogen Atom.** সেখানে পিএইচডি করার পর বিখ্যাত ক্যালটেক থেকে তার ডক্টরেট-উত্তর গবেষণা সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবনঃ

ড. জাফর ইকবাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৫ সালে অনার্স-এ দুই নম্বরের ব্যবধানে প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৮২ তে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়া ইনিস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে সাফল্যের সাথে ডক্টরেটোত্তর গবেষণা সম্পন্ন করেন। ১৯৮৮ তে তিনি বিখ্যাত বেল কমিউনিকেশনস রিসার্চ (বেল কোর) এ গবেষক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৪ পর্যন্ত সেখানেই কাজ করেন। ওই বছরেই তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। তিনি একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য মনোনীত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন শিক্ষক সমিতির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন।

সাহিত্যঃ

জাফর ইকবাল বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই লেখালেখি করেন। তার প্রথম সায়েন্স-ফিকশন গল্প *কপোট্রনিক ভালোবাসা* সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি পড়ে একজন পাঠক দাবি করেন সেটি বিদেশি গল্প থেকে চুরি করা। এর উত্তর হিসেবে তিনি একই ধরণের বেশ কয়েকটি বিচিত্রার পরপর কয়েকটি সংখ্যায় লিখে পাঠান। তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে এই গল্পগুলো নিয়ে *কপোট্রনিক সুখ-দুঃখ* নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই বইটি পড়ে শহীদ-জননী জাহানারা ইমাম খুবই প্রশংসা করেন এবং এই ঘটনায় তিনি এ ধরণের আরও বই লিখতে উৎসাহিত হন। তার প্রথম দিকের বিজ্ঞান কল্পকাহিনীগুলো পাঠকমহলে সমাদৃত হয়। সুদূর আমেরিকাতে বসে তিনি বেশ কয়েকটি সায়েন্স-ফিকশান রচনা করেন। দেশে ফিরে এসেও তিনি নিয়মিত বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী লিখে যাচ্ছেন, প্রতি বইমেলাতে তার নতুন সায়েন্স ফিকশান কেনার জন্যে পাঠকেরা ভীড় জমায়।

তিনি কিশোর উপন্যাসের লেখক হিসেবেও অত্যন্ত সফল। এই শাখাতেই তার প্রতিভা সর্বোচ্চ শিখর ছুঁয়েছে। তার লেখা অনেকগুলো কিশোর উপন্যাস বাংলা কিশোর-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তার একাধিক কিশোর উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

তার বৈশিষ্ট্যসূচক সহজ ভাষায় লেখা কলামগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি দৈনিক প্রথম আলোতে *সাদাসিধে কথা* নামে নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন। তাঁর লেখা কলামগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনা এবং দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর স্বাধীনতা-বিরোধী ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি মত প্রকাশ এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার ধারক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী ছাত্র সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে অবস্থান বিভিন্ন সময় প্রতিক্রিয়াশীলদের রোষানলে পড়েছে।

বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড গড়ে তোলার পিছনে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। গণিত শিক্ষার উপর তিনি ও অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ বেশ কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এর মাঝে "নিউরনে অনুরণন" ও "নিউরনে আবারো অনুরণন" বই দুটি গনিতে আগ্রহীদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পুরস্কারঃ

- বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ২০০৪
- শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে ২০০৫ সালে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার
- কাজী মাহবুবুল্লা জেবুন্নেছা পদক ২০০২
- খালেদা চৌধুরি সাহিত্য পদক বাংলা ১৪১০
- শেলটেক সাহিত্য পদক ২০০৩
- ইউরো শিশুসাহিত্য পদক ২০০৪
- মোহা. মুদাব্বর-হুসনে আরা সাহিত্য পদক ২০০৫
- মার্কেন্টাইল ব্যাংক সম্মাননা পদক ২০০৫
- আমেরিকা এল্যাইমনি এ্যাসোসিয়েশন পদক ২০০৫
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালাইমনি এ্যাসোসিয়েশন পদক '০৫

তরুন প্রজন্মের কাছে প্রার্থনা

খুব সহজে আমার মন খারাপ হয় না কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে আমার খুব মন খারাপ। যারা এক নজর পত্রিকার দিকে তাকাবে কিংবা টেলিভিশনে খবর শুনবে তাদেরও মন খারাপ হয়ে যাবে। শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে এই দেশে মানুষের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ভয়ে আতংকে জীবন বাঁচাবার জন্যে এই মানুষগুলো নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে। বাড়ীর মেয়েদের বাড়ী থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। ১৯৭১ সালে হিন্দু মুসলমান সবাই আক্রান্ত হয়েছিল। মুসলমান হলে কখনো কখনো হয়তো মানুষ বেঁচে গিয়েছে কিন্তু হিন্দু হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে কেউ কখনো প্রানে বেঁচে ফিরে আসেনি। ১৯৭১ সালে আমরা গ্রামে লুকিয়ে আছি তখন দেখেছি একজন হিন্দু মা তার শিশু সন্তানকে বুকে চেপে ধরে স্বামীর পিছু পিছু ছুটে যাচ্ছে, তাদের চোখ মুখের সেই উদভ্রান্ত অসহায় দৃষ্টি আমি কখনো ভুলতে পারব না। তেতাল্লিশ বছর পর এই বাংলাদেশে এখনো একজন অসহায় হিন্দু মা তার সন্তানকে বুকে চেপে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছুটে যাচ্ছে। তার মানে যে দেশকে নিয়ে আমরা এতো গর্ব করি সেই দেশটি আসলে তেতাল্লিশ বছরে এক ইঞ্চিও সামনে অগ্রসর হয়নি। এর চাইতে বড় দুঃখ লজ্জা আর অপমান কী হতে পারে ?

আমি মাঝে মাঝে কল্পনা করি আমি যদি এই দেশে একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হতাম তাহলে আমার কেমন লাগতো। আমি জানি তাহলে গভীর হতাশায় আমার বুক ভেঙ্গে যেতো, আমি কোন দোষ করিনি কিন্তু শুধুমাত্র একটি হিন্দু পরিবারে জন্ম নিয়েছি বলে আমার উপর যে নৃশংস অত্যাচার করা হচ্ছে তার জন্য আমার বুকে যেটুকু ক্ষোভ জন্ম নিতো তার চাইতে শতগুন বেশী অভিমান হতো আমার চারপাশের নির্লিপ্ত মানুষজনকে দেখে। কেউ কোনো কথা বলছে না, নীরবে এক ধরণের করুনা নিয়ে আমাকে দেখছে। সম্ভবত সবচেয়ে বেশী ক্ষোভ হতো রাজনৈতিক দল গুলোর উপর, প্রতিবার নির্বাচনের পর, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় হবার পর, রায় কার্যকর হবার পর আমাদের উপর হামলা করা হবে। বিএনপি জামাত হামলা করবে, আওয়ামীলীগ বা বামদলগুলো সেটা ঘটতে দেবে। খুব বেশী হলে নিরাপদ দুরত্ব থেকে প্রতিবাদ করবে কিন্তু বুক আগলে কেউ রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। এই দেশে আমি যদি হিন্দু ধর্মাবলম্বী হতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমার বার বার মনে হতো আমি এই দেশের মানুষ কিন্তু এই দেশটি আমাকে রক্ষা করছে না। আমি নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার কাছে অভিযোগ করে বলতাম তুমি কেন আমাকে এমন একটি দেশে জন্ম দিয়েছ যেই দেশ আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয় না ? সেই দেশে আমাকে প্রতি মূহুর্তে আতংকে থাকতে হয় ? কিন্তু আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী নই, তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের বুকের ভেতর যে গভীর দুঃখ ক্ষোভ হতাশা আর অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে আছে আমি সেটা কোনোদিন অনুভব করতে পারব না।

আমাদের প্রিয় দেশটি নিয়ে আমাদের কত কল্পনা , কত স্বপ্ন। আমরা আশা করে আছি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে, জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে যাবে একদিন দেশটা মাথা তুলে দাঁড়াবে। আমরা এর মাঝে সেগুলো এই দেশে শুরু হতে দেখেছি। কিন্তু এই মূহুর্তে আমার কাছে সবকিছু অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। যদি আমরা একজন মানুষকে শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্যে এই দেশে তাকে নিরাপত্তা দিতে না পারি তাহলে এই দেশটি কাদের জন্যে? আমার মনে হয় এই দেশ নিয়ে আমাদের যত কল্পনা, যত স্বপ্ন, যত পরিকল্পনা সবকিছুকে পিছনে সরিয়ে সবার আগে আমাদের এখন একটি মাত্র লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে আসতে হবে। সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে এই দেশে একটি হিন্দু শিশু যেন নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় তার মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে পারে। গভীর রাতে ধর্মান্ধ মানুষের উন্মত্ত চিৎকারে তাদের যেন জেগে উঠতে না হয়, আগুনের লেলিহান শিখায় আপনজনের আতংকিত মুখ দেখতে না হয়। একজন হিন্দু কিশোরীকে যেন তার বাবার রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে যেন বলতে না হয়, "এখন কী হবে বাবা?"

আমরা পদ্মা সেতু চাই না, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ চাই না, যানজটমুক্ত বাংলাদেশ চাই না, শতকরা একশভাগ নিরক্ষর চাই না, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ চাই না শুধুমাত্র হিন্দু এবং অন্য সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা চাই যেন তারাও ঠিক আমাদের মত এই দেশটিকে তাদের নিজেদের ভালোবাসার দেশ বলে ভাবতে পারে। তীব্র অভিমানে তাদের বুক ভেঙ্গে যেন আর কোনোদিন খান খান হয়ে না যায়।

আমি কার কাছে এটি চাইব জানি না, তাই তরুন প্রজন্মের কাছে চাইছি। তোমরা আমাদেরকে একটি নূতন বাংলাদেশ উপহার দাও। যে বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প চিরদিনের জন্যে মুছে দেয়া হবে। আমি জানি তোমরা পারবে।

আমার দেখা গণজাগরণ মঞ্চ

সবারই নিশ্চয়ই সেই দিনটার কথা মনে আছে। কাদের মোল্লার বিচারের রায় হয়েছে। সব অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, যে কোনো একটা অপরাধের জন্যেই দশবার ফাঁসি দেয়া যায় কিন্তু কাদের মোল্লাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সারা দেশের সকল মানুষের ভুরু একসাথে কুঁচকে গেল, তাহলে কী এই পুরো বিচারের বিষয়টা আসলে একটা প্রহসন ? নাকি বিচারকদের ভেতরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ? সরকার কী যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে আন্তরিক ? আমাদের বয়সী মানুষের লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া করার কিছু নেই। তাই আমরা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণের মাঝে আমার অফিসে ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করল। তারা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে থাকতে রাজি না। আমার কাছে জানতে চায় কী করবে ? আমি জানি, তরুণদের ভেতরে যখন ক্রোধ ফুঁসে উঠে, তখন সেটাকে বের করে দেয়ার একটা পথ করে দিতে হয়। কীভাবে তারা তাদের ক্রোধটাকে বের করবে জানে না- আমিও জানি না। তারা নিজেরাই একটা পথ বের করে নিল, যখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে তখন দলবেধে ক্যাম্পাসে শ্লোগান দিতে শুরু করল। আমি ভাবলাম এখন হয়তো তাদের ক্রোধটা একটু প্রশমিত হবে।

আমি তার মাঝে খবর পেতে শুরু করেছি ঢাকার শাহবাগে কিছু তরুণ এসে জমা হয়েছে। তারা দাবি করছে যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীর সঠিক বিচার না হবে, তারা ঘরে ফিরবে না। শুনে আমার বেশ ভালো লাগল- তারা সরকারের কাছে দাবি করে যুদ্ধাপরাধীদের সত্যিকারভাবে বিচার করে ফেলতে পারবে সে জন্যে নয়। এই দেশের তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধকে এত তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে, সেই বিষয়টি আমার জন্যে নতুন এক ধরণের উপলব্ধি। এরপরের বিষয়গুলো খুবই চমকপ্রদ। শাহবাগ অঙ্গনে কয়জন মিলে যে জমায়েত শুরু করেছে, দেখতে দেখতে সেটি নাকি বড় হতে শুরু করেছে। খুব দ্রুত আমরা জেনে গেলাম শাহবাগ লোকে-লোকারণ্য। আমরা এক ধরণের বিস্ময় নিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে থাকি। আমাদের সবার ভেতর এক ধরণের কৌতূহল, এক ধরণের উত্তেজনা। আমার বাসায় টেলিভিশন নেই, তাই সরাসরি টেলিভিশনে দেখতে পাচ্ছি না। খবরের কাগজ, ইন্টারনেটে খবর নিই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তরুণদের এই মহাসমাবেশটি নিজের চোখে দেখার খুব আগ্রহ ছিল কিন্তু আমি জানি সেটি হয়তো আমার কপালে নেই। আমি সিলেটে থাকি, ঢাকা যেতে যেতে এখনও কয়েকদিন বাকি, যখন ঢাকা পৌঁছাব, ততদিনে হয়তো এই সমাবেশটি শেষ হয়ে যাবে। কোনো জমায়েতই তো আর দিনের পর দিন থাকতে পারে না।

সিলেট থেকে আমি ঢাকা রওনা দিয়েছি ফেব্রুয়ারির সাত তারিখ। আমার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু তখনও সমাবেশটি টিকে আছে। কোনোমতে ধুকপুক করে টিকে নেই, খুব জোরেসোরে টিকে আছে। আমার মনে হলো, আমি হয়তো গিয়ে তরুণদের এই সমাবেশটি নিজের চোখে দেখতে পাব।

রাতে গাড়ি করে আসছি তখন দেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, এরকম মানুষজন আমাকে ফোন করতে শুরু করলেন। সবারই এক ধরণের কৌতূহল। যারা এই বিষয়টা শুরু করেছে, তারা কারা ? আচ্ছা, আবছা শুনতে পেলাম তারা নাকি এক ধরণের ব্লগার। এবারে আমার একটু অবাক হওয়ার পালা। মাত্র কয়দিন আগে আমি পত্রিকায় একটা ছোট প্রবন্ধ লিখেছি। নেটওয়ার্ক প্রজন্মকে সেখানে হালকাভাবে দোষ দিয়ে বলেছি, তোমরা ফেসবুকে লাইক দিয়ে তোমাদের দায়িত্ব শেষ করে ফেলো, কখনও তার চাইতে বেশি কিছু করো না। এখন নিজের চোখে দেখছি, আমার অভিযোগ ভুল। তারা অবশ্যই পথে নামতে পারে। শুধু নামতে পারে না- তারা পথে দিনরাত থাকতেও পারে।

গাড়িতে আসতে আসতে বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কথা হলো। কয়েকজন ছাত্রজীবনে রাজনীতি করেছেন। কীভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়, বাঁচিয়ে রাখতে হয়, সেটাকে তুলে নিয়ে যেতে হয় সব তাদের নখদর্পনে। তারা নানাধরণের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে লাগলেন, বলতে লাগলেন এধরণের বিচিত্র একটা আন্দোলন অনির্দিষ্টকাল চালিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এখন এটাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

এই তরুণ ছেলেমেয়েদের যেটা জাতিকে দেখানোর প্রয়োজন ছিল, সেটা তারা দেখিয়ে দিয়েছে। তারা প্রমাণ করে দিয়েছে, এই দেশের তরুণ প্রজন্ম দেশকে তীব্রভাবে ভালোবাসে, যুদ্ধাপরাধীর বিচারের শেষ তারা দেখতে চায়। আমার রাজনীতিতে অভিজ্ঞ বন্ধুরা বললেন, এই তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে বোঝাতে হবে, সবকিছু খুব চমৎকার একটা জায়গায় পৌঁছেছে। এখন তাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, যেন তাদের ভেতর একটা বিজয়ের অনুভূতি থাকে। এসব ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই যে যেটাই বলে আমি শুনি এবং মাথা নেড়ে যাই।

আট তারিখ ইমরান নামে একজন আমাকে ফোন করল। সে শাহবাগের তরুণদের একজন, আমার সাথে কথা বলতে চায়। আমি বললাম, বিকেলে যে মহাসমাবেশ আমি সেটা দেখতে যাব, তখন দেখা হতে পারে। ইমরান নামটি একটু পরিচিত মনে হলো। শাহবাগের তরুণদের মাঝে যে কয়জনের নাম শোনা গেছে, তার মাঝে ইমরান একজন। পেশায় ডাক্তার।

যাই হোক, বিকেলে আমি আর আমার স্ত্রী ইয়াসমীন শাহবাগে গিয়ে হাজির হলাম। যেদিকে তাকাই সেদিকেই মানুষ। আমি চোখের কোণা দিয়ে খুঁজতে লাগলাম আমার মতো বয়সী সাদাচুলের এক দুইজন দেখা যায় কী না! বেশ কয়েকজনকে পেয়ে গেলাম, তখন একটু স্বস্তি বোধ করলাম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ কয়েকজন শিক্ষকও শাহবাগে এসেছে। তাদেরকে নিয়ে আমরা পথে বসে পড়েছি। আমার ভাইবোন ঢাকা থাকে, তারা এর মাঝে শাহবাগ ঘুরে গেছে। তাদের কাছে শুনেছি, শাহবাগের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে সেখানকার শ্লোগান। এরকম শ্লোগান নাকি পৃথিবীর কোথাও নেই !

আমরা পথে বসে বসে সেই শ্লোগান শুনছি। মাঝে মাঝে বক্তৃতা হচ্ছে, সেই বক্তৃতাও শুনছি। চারপাশে যেদিকে তাকাই সেদিকেই মানুষ। শেষবার একসাথে এতো মানুষ কখন দেখেছি আমি মনে করতে পারি না। হঠাৎ করে শুনলাম মাইকে আমার নাম ঘোষণা করে আমাকে মঞ্চে ডাকছে। আমি একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। মাথার মাঝে একটু দুশ্চিন্তা খেলা করে গেল, যদি আমাকে বক্তৃতা দিতে বলে তখন কী করব?

যাই হোক, আমি আর ইয়াসমীন মানুষের ভীড়ের মাঝে দিয়ে হেঁটে হেঁটে মঞ্চের দিকে যেতে থাকি। মঞ্চটি খুবই সহজ-সরল, একটা খোলা ট্রাক। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে যে গণজমায়েত করেছিলেন, সেই মঞ্চও ছিল খোলা ট্রাক। আমার মায়ের কাছে তার গল্প শুনেছি, আমার মা সেখানে ছিলেন।

দর্শক শ্রোতা আমাদের পথ করে দিল, আমি আর ইয়াসমীন ভীড়ের মাঝে হেঁটে হেঁটে ট্রাকের কাছে হাজির হলাম। দু'জনকে মোটামুটি টেনে-হিঁচড়ে ট্রাকে তুলে দেওয়া হলো! ট্রাকের উপর উঠে একটু স্বস্তি

পেলাম, সেখানে আমার পরিচিত অনেকেই আছে। যারা ব্লগার, তাদের মাথায় হলুদ ফিতা বাঁধা। ইমরান নামের ডাক্তার ছেলেটির সাথে পরিচয় হলো। হেঁটে হেঁটে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি, যতদূর তাকাই, শুধু মানুষ আর মানুষ। এরা সবাই যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবিতে এখানে এসেছে। দেখেও আমার আঁশ মিটে না, যত দেখি ততই অবিশ্বাস্য মনে হয়।

সামনে একজন একজন করে বক্তৃতা দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই বক্তৃতা থামিয়ে শ্লোগান। মানুষ যেভাবে কনসার্টে গান শুনতে যায়, অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি এই বিশাল জনসমাবেশ দেখে মনে হলো এখানেও সবাই বুঝি সেভাবে শ্লোগান শুনতে এসেছে। গান শুনে মানুষ যেরকম আনন্দ পায়, মনে হচ্ছে শ্লোগান শুনে সবাই বুঝি সেই একই আনন্দ পাচ্ছে। আমি হেঁটে হেঁটে ট্রাকের পিছনে গিয়েছি, তখন লম্বা একটা ছেলের সাথে কথা হলো।

মাথায় হলুদ ফিতা, সেও নিশ্চয়ই একজন ব্লগার, আমাকে বলল, 'স্যার, একটা বিষয় জানেন ?'
আমি বললাম, 'কী?'
সে বলল, 'এই পুরো ব্যাপারটি শুরু করেছি আমরা ব্লগাররা ! কিন্তু এখন কেউ আর আমাদের কথা বলে না!' কথা শেষ করে ছেলেটি হেসে ফেলল।

আমি তখনও জানতাম না, এই ছেলেটি রাজীব এবং আর কয়েকদিন পরেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে একত্র হওয়া এই তরুণদের নাস্তিক অপবাদ দিয়ে বিশাল একটা প্রচারণা শুরু হবে আর সেই ষড়যন্ত্রের প্রথম বলি হবে এই তরুণটি।

হঠাৎ করে আমার ডাক পড়ল, এখন আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। আমি শিক্ষক মানুষ, দিনে কয়েকবার ক্লাশে গিয়ে টানা পঞ্চাশ মিনিট কথা বলি। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের নানা ধরণের আয়োজনে কথা বলতে হয়, সেখানে মাঝে মাঝেই দুই চার হাজার উপস্থিতি থাকে সেখানেও কথা বলেছি। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আমার সামনে, পিছনে, ডানে, বামে নিশ্চিতভাবেই কয়েক লক্ষ মানুষ! আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কী বলব ? কীভাবে বলব ?

আমি তখন আমার মতো করেই বললাম। কী বলেছিলাম, এখন আর মনে নেই। শুধু দুটো বিষয় মনে আছে। এক: তরুণ প্রজন্মের ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করেছিলাম- তারা শুধু ফেসবুকে ‘লাইক’ দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করে ফেলে বলে যে অভিযোগ করেছিলাম, সে জন্যে তাদের কাছে ক্ষমা চাইলাম। এবং দুই: রাজীবের মনের দুঃখটা দূর করার জন্যে আলাদাভাবে তরুণ প্রজন্মের ব্লগারদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম! রাজীব সেটা শুনেছিল কী না আমি জানি না। শাহবাগের তরুণদের এই বিশাল সমাবেশ শাহবাগ থেকে ধীরে ধীরে সারাদেশে, তারপর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। যখন একটা আন্দোলন তীব্রভাবে মানুষের আবেগকে স্পর্শ করতে পারে তখন তাকে ঠেকানোর সাধ্য কারোর নেই।

তারপর বহুদিন পার হয়ে গেছে। শাহবাগের এই বিশাল সমাবেশ এখন সবাই গণজাগরণ মঞ্চ বলে জানে। সুদীর্ঘ এক বছর এটি অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য এই গণবিস্ফোরণকে ঠেকানোর জন্যে যুদ্ধাপরাধীর দল এমন কোনো কাজ নেই যেটা করেনি। তাদের শেষ অস্ত্র হচ্ছে ধর্ম, সেই ধর্মকে তারা হিংস্রভাবে ব্যবহার করেছে। হেফাজতে ইসলাম নামে অত্যন্ত বিচিত্র একটা সংগঠন হঠাৎ করে গজিয়ে উঠল। তাদের তাণ্ডবের কথা এই দেশের মানুষ কখনও ভুলবে না।

গণজাগরণ মঞ্চ সেই ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে। এক বছরে তাদের অর্জন কেউ খাটো করে দেখবে না। যে কাদের মোল্লার শাস্তি দিয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই কাদের মোল্লার শাস্তি কার্যকর করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজ থেকে শতবর্ষ পরে যখন বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হবে, সেখানে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে লেখা হবে। এই দেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্যে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্বটি পালন করেছিল গণজাগরণ মঞ্চ।

বাংলাদেশকে গ্লানিমুক্ত করার প্রক্রিয়ায় তাদের অবদানের কথা কেউ ভুলবে না। ভবিষ্যতে আমরা তাদের কাছে আর কী প্রত্যাশা করতে পারি ?

একজন অনয়ের গল্প

১.

ঘুম থেকে উঠেই আমার মনে পড়ল আজকের দিনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, সেটা স্বচক্ষে দেখার জন্যে আমার সকাল সাড়ে এগারোটার সময় একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে।

ঢাকা শহরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে কতোটুকু সময় লাগবে তার কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই। এ সম্পর্কে একজন একটা থিওরি দিয়েছে সেটা এরকম- ঢাকা শহরে গাড়ি করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। রিকশায় গেলে দুই ঘণ্টা, হেঁটে গেলে সময়টাকে এক ঘণ্টায় নামিয়ে আনা যায়। আমি গাড়ি করে যাব। তাই আমার তিন ঘণ্টা হাতে নিয়ে বের হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু আমি আশাবাদী মানুষ তাই দেড় ঘণ্টা হাতে নিয়েই বের হয়ে গেলাম। আমার ভাগ্য ভালো, পথে নানারকম ছোট বড় মাঝারি সরল এবং জটিল ট্রাফিক জ্যাম অতিক্রম করে আমি ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। আমার গন্তব্য ছিল সিদ্ধেশ্বরি বয়েজ হাই স্কুল। আমি আগে কখনো আসিনি, কিন্তু জায়গাটা খুঁজে পেতে সেরকম সমস্যা হল না। পৌঁছে দেখি অন্যরা সবাই চলে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, যারা একটু দূর থেকে এসেছে। তাদের কেউ ভোর সাতটায় রওনা দিয়েছে, তারা সবাই এই ঘটনাটি নিজের চোখে দেখতে চায়।

আমি পৌঁছানো মাত্রই সেখানে একটা উত্তেজনা শুরু হল, কারণ আমি জানতে পারলাম আমি নাকি প্রধান অতিথি! (আমাদের দেশের এই প্রধান অতিথি এবং অ-প্রধান বা গণ্য অতিথির কালচারটা আমি ভালো করে বুঝতে পারি না। আশা করছি ধীরে ধীরে এটা উঠে যাবে-এক সময় সব অতিথিই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হবে)। আমাকে ঢাউস একটা ফুলের তোড়া দেওয়া হল এবং আট দশ বছরের ছেলেরা আমাকে ঘিরে ধরল। তাদের হাতে ছোট বড় মাঝারি কাগজের টুকরো- কিছু কিছু কাগজের টুকরোর অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়- মনে হয় রাস্তা থেকে তুলে এনেছে !

সবারই অটোগ্রাফের দরকার, যাদের হাতে কাগজ নেই তারা তাদের হাতটাই বাড়িয়ে দিল- সরাসরি হাতের তালুতে অটোগ্রাফ দিতে হবে। (এটি নতুন পদ্ধতি এবং খুব দ্রুত জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে!) আমি বাচ্চাগুলোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, আগে যে কাজটা করতে এসেছি সেটা সেরে ফেলি, তারপর সবাইকে অটোগ্রাফ দেওয়া যাবে। আমি তাদের কথা দিলাম তাদের সবাইকে অটোগ্রাফ না দিয়ে যাব না।

ছোট বাচ্চারা মোটেও রাজনৈতিক নেতাদের মতো না, তারা আমার কথা বিশ্বাস করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছোটাছুটি শুরু করল। এই বয়সী বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি, হুটোপুটি থেকে সুন্দর দৃশ্য খুব বেশি নেই।

আমি তখন যে কাজটি করতে এসেছি, সেই কাজটি করতে এগিয়ে গেলাম। আমার মনে হয় আমি কী কাজ করতে এসেছি, এখন সেটি বলার সময় হয়েছে।

এই স্কুলে 'অনয়' নামে একটি ছোট ছেলে লেখাপড়া করে। তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তার কারণ এই ছেলেটি অন্য দশটি ছেলের মতো নিজের পায়ে ছোটাছুটি করতে পারে না, তাকে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত নিচের তলায় ক্লাসরুম-তার কোনো সমস্যা হয়নি, সিক্সে ওঠার পর ক্লাসরুম দোতলায়-হঠাৎ করে তার ক্লাসে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

যাদের এরকম ছেলে মেয়ে আছে এবং যারা তাদের সেই ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করতে চান তারা সবাই এই কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। হঠাৎ করে আবিষ্কার করেন শুধুমাত্র ক্লাসরুম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না বলে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। যখন এই দেশের শিক্ষানীতি তৈরি করা হয় তখন অনেকের ছিলাম। আমিও সেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির একজন সদস্য ছিলাম।

আমার সবাই মিলে খুব আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে এই শিক্ষানীতি একীভূত (Inclusve) শিক্ষা নামে একটা শব্দ ঢুকিয়েছিলাম, যার অর্থ এই দেশের সব ধরনের ছেলে মেয়ে একাই সঙ্গে পড়াশোনা করতে পারবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী নামে একটা ভয়ংকর শব্দ আবিষ্কার করে বিশেষ ধরনের ছেলে-মেয়েদের শরীরে এই সিল মেরে দিয়ে আমরা তাদেরকে আলাদা স্কুলে পাঠিয়ে দিতাম।

এই শিক্ষানীতি নেই প্রক্রিয়াটিকে বাতিল করে সবার জন্যেই জানি একই ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থাটি চালু করে দিয়েছিল। আমি যতদূর আইনের অবস্থা ট্রাফিক আইনের মত, কেউ সেটা মানে না। যদি কোনো অসহয় বাবা মা হুইল চেয়ার আটকে থাকা তার ছেলে কিংবা মেয়ের লেখা পড়ার জন্যে এই আইনটির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তখন কোনো লাভ হয়না। ওটকো একটা ঝামেলা নেড়ে যেন নিতে না হয় তা জন্যে তার নানা রকম ফন্দিফিকির বের করেন। ভর্তি করার জন্যে তাদের টেস্ট নেওয়া হয়, সেই টেস্টে তাদের ফেল করে দেয়া হয়। এই গল্পগুলো আমি হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে সেরকম ছেলেমেয়ের বাবা মায়ের মুখে শুনেছি।

সিদ্ধেশ্বরি বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্র অনয়ের কপালেও এরকম একটা কিছু ঘটতে শুরু করল এতোদিন একতালায় ক্লাস হয়েছে কোনো সমস্যা হয়নি, দোতালায় ক্লাসটা চলে যাবার পর অনয় আর তার বাবা মায়ের কথায় আকাশ ভেঙে পড়ল! ঠিক তখন একটা চমৎকার ঘটনা ঘটল বিস্ক্যান (BSCAN: Bangladeshi System Change Advocacy Group) নামের একটা প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারটা জানতে পারল।

আমার মনে হয় বিস্ক্যান সম্পর্কে দুই একটা কথা বলা দরকার, অনেকদিন আগে সাবরিনা সুলতানা নামে একটা মেয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, সে এই সংগঠনটি গড়ে তুলছে অনেক স্বেচ্ছাসেবক এই কাজ করে। যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী তাদের অধিকার সম্পর্ক সবাইকে সচেতন করাই হচ্ছে এই সংগঠনেরই মূল কাজ। সাবরিনা খুব সুন্দর লিখতে পারে, ক্লাসে সে অসাধারণ কিছু লেখা লিখে অনেক তরুণদের এই ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছে।

আমার প্রথম যেদিন সাবরিনার সঙ্গে দেখা হল, আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, কারণ সে হুইল চেয়ারে আটকা পড়ে আছে একটা হাতের এক দুইটা আঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই সে ব্যবহার করতে পারে না। আমি আমার সমস্ত শরীর হাত পা ব্যবহার করেই তার থেকে বেশি কাজ করতে পারে দেখে 'প্রতিবন্ধী' মানুষ সম্পর্কে মানুষ আমার ধারণাই পাল্টে গিয়েছিল। আমি এখন প্রতিবন্ধী বলে এই কুৎসিত শব্দ ব্যবহার করি না- আমার কাছে তারা বিশেষ (Special) মানুষ।

আসাধারণ সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমি তাকে আমার নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি, সে আমাকে কিছু একটা করতে বললে আমি সেটা করার চেষ্টা করি। সে আমকে আজ সাড়ে এগারটায় এই স্কুলে আসতে বলেছে- আমি তাই চলে এসেছি।

সাবরিনা চট্টগ্রাম থাকে, তার জন্যে ঢাকা আসা রীতিমত একটা বিশাল এডভেঞ্চার, তাকে সবকিছুর জন্যে এই এডভেঞ্চার করতে হয় না কারণ বি-স্ক্যানের সাধারণ সম্পাদক সালমা মাহবুব ঢাকা থাকে। সালমা-সাবরিনা একটা অসাধারণ জুটি তাদের কাজের কোনো তুলনা নেই। এই স্কুলের ছেলেটিকে কীভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ দেওয়া যায় সেটা নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করতে লাগল এবং তারা যে সমাধান বের করল তার কোনো তুলনা নেই। ঠিক করা হল স্কুলের দোতলায় ওঠার জন্য একটা লিফট বসানো হবে।

আমি জানি সবাই চমকে উঠেছে, একটা স্কুলে লিফট বসানো নিশ্চয়ই সোজা কথা নয়- এটা তো লাখ লাখ টাকা খরচের ব্যাপার শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের সাধারণ একটা স্কুলে একট লিফট বসানোর সুযোগ কোথায় ?

কিন্তু এসব কিছুই সমস্যা নয়, কারণ যে লিফটি বসানো হবে সেটা ম্যানুয়েল লিফট। এটা চালাতে ইলেকট্রিসিটি লাগবে না, একজন হাত দিয়ে হ্যান্ডেলের মতো একটা জিনিষ ঘুরিয়ে ওপরে তুলে নিতে পারবে, নিচে নামিয়ে আনতে পারবে।

যিনি সেই ম্যানুয়েল লিফট ডিজাইন করেছেন তার নাম মহিউদ্দিন বাবুল। এটি তার প্রথম ডিজাইন নয়। সাভারের সিআরপি এর জন্যে তিনি আগেও এটা তৈরি করেছেন। এই লিফটটি বসানোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন, অনয়ের বাবা ছেলের লেখাপড়ার জন্য খবরটা বহন করেছেন। আজকে সেই ম্যানুয়েল লিফটি উদ্বোধন করা হবে এবং আমি সেটা নিজের চোখে দেখার জন্য ছুটে এসেছি।

মহিউদ্দিন বাবুল নামে যিনি এই লিফটি তৈরি করেছেন তার সঙ্গে পরিচয় হল-ঘটনাক্রমে তিনিও হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন। শৈশবে গাছ থেকে পড়ে মেরুদণ্ডতে আঘাত পেয়েছিলেন। সাবরিনা-সালমা জুটি চলে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে অনয় নামের যে শিশুটির জন্যে এই দজ্ঞযজ্ঞ সেও চলে এল। এখন বাকী আছে এই ম্যানুয়েল লিফটটা উদ্বোধন করা।

আমরা সবাই মিলে রওনা দিলাম। নিচতলায় স্কুলের বারান্দায় ওঠার জন্য এবং একটা বারান্দা থেকে অন্য বারান্দায় যাবার জন্যে দুটো র‍্যাম্প (ঢালু পথ) তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো তৈরি করে দিয়েছে কানাডার টরেন্ট শহরের একটি সংগঠন। আমাদের সঙ্গে এই স্কুলের ছোট ছেলেদের বিশাল একটা বাহিনী তাদের উৎসাহের কোনো সীমা নেই।

লিফটের সামনে হাজির হওয়ার পর আমি আবিষ্কার করলাম আমার জন্য ছোট একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। ফিতা কেটে আমাকেই এই লিফটের উদ্বোধন করতে হবে। সালমা-সাবরিনার কিংবা লিফট ডিজাইনার মহিউদ্দিন বাবুলের এটি উদ্বোধন করে দেওয়ার অধিকার আমার আমার থেকে একশত গুণ বেশি, কিন্তু কিছু করার নেই। ঘটনাটি সাংবাদিকদের জানানো হয়েছে, আমি এক ধরনের আনন্দ মেশানো বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম অনেক সাংবাদিক, টেলিভিশনের ক্রু চলে এসেছেন। এই অসাধারণ ঘটনাটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক মানুষ দেখতে পাবে।

অনয়, আর হেডমাস্টারকে নিয়ে আমি লিফটের ভেতর ঢুকে গেলাম, সামনে একটা ফিতা লাগানো হয়েছে সেটা কেটে দেবার পর একটা গগন বিদায়ী চিৎকার দেওয়া হলো। যে সকল অনুষ্ঠানে ছোট ছোট বাচ্চা থাকে সেখানে অত্যন্ত চমকপ্রদ গগণ বিদারী চিৎকার দেওয়া সম্ভব।

উদ্বোধনের পর আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল অনয়কে নিয়ে এই লিফটে করে দোতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমি জবুথবু ধরনের মানুষ, ভুল কিছু করে ফেলে মাঝপথে আটকা পড়ে যাই কিনা-কিংবা উপর থেকে নিচে ফেলে দিই কিনা সেটা নিয়ে নিজের ভেতর দুর্ভাবনা ছিল, তাই আরেকজন সঙ্গে উঠে গেলেন। তারপর হ্যান্ডেলটা ঘোরানো শুরু করতেই এই ম্যানুয়েল লিফট তরতর করে উপরে উঠতে শুরু করল। দেখতে দেখতে আমরা দোতলায় উঠে গেলাম। অন্য বাচ্চারা এর মাঝে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সবাই মিলে একটা আনন্দোল্লাসের মাঝে অনয়ের হুইল চেয়ারটা ঠেলে তার ক্লাসরুমে নিয়ে যাওয়া হল।

আমার হিসেবে বাংলাদেশে একটা ইতিহাস রচিত হল।

২.

আমি জানি অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন উশখুশ করছে, এই ম্যানুয়েল লিফটটা তৈরি করতে কতো খরচ হয়েছে ? আমি জানি-শুনে অনেকেই অবাক হয়ে যাবে। একটা ভাল ল্যাপটপ কিনতে যত টাকা খরচ হয়- এই লিফটটি তৈরি করতে সেরকম খরচ পড়েছে- মাত্র নব্বই হাজার টাকা। যার অর্থ একটা স্কুলে এরকম একটা লিফট বসানোর জন্যে কাউকে বিদেশি অনুদানের জন্য বসে থাকতে হবে না, বড় বড় কর্পোরেশনের কাছে হাত পাততে হবে না, কয়েকজন মিলেই এটা তৈরি করে ফেলতে পারবে। আমার ধারণা মোটামুটি বড় একটা স্কুলের ছেলে মেয়েরা নিজেরাই চাঁদা তুলে তাদের স্কুলে এ রকম ম্যানুয়েল লিফট বসিয়ে ফেলতে পারবে।

সবাই নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছে এই ঘটনাটি নিয়ে আমি খুবই উত্তেজিত-হওয়ার কারণও আছে। পৃথিবীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী যে কোনো দেশের শতকরা পনেরো ভাগ মানুষ হচ্ছে কোনো না কোনো ধরনের 'প্রতিবন্ধী' (কুৎসিত শব্দটা আবার ব্যবহার করতে হলো!)। তার মাঝে একটা অংশকে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। যারা হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে তারা যেন যে কোনো বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতে পারে, বাথরুমে যেতে পারে- অর্থাৎ তাদের প্রবেশগম্যতা থাকে তার জন্যে দেশে আইন আছে। অন্য অনেক আইনের মতো এই আইনটিও এখনও সেভাবে মানা শুরু হয়নি।

আমরা আশা করছি সেটা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এর মাঝে সিদ্ধেশ্বরি বয়েজ হাইস্কুলের ঘটনাটি আমাদের মাঝে নূতন একটা আশা দিয়েছে। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে এরকম অসংখ্য ছেলে মেয়েকে এই দেশের অনেক স্কুল ফিরিয়ে দিয়েছে- এখন তাদের আর ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। এরকম একটা খবর পেলে বি-স্ক্যানের মত সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে সেই স্কুলের ওপর চড়াও হতে পারবে। তাদের বাধ্য করা যেতে পারে একটা ছোট শিশুর লেখা পড়া যেন তারা নিশ্চিত করে। এরকম একটা

ছোট শিশুকে স্কুলে নেওয়া হলে কারও কারও একটু বাড়তি ‘ঝামেলা’ হতে পারে। কিন্তু আমি সবাইকে বলে দিতে পারি এই ছোট একটুখানি ঝামেলা সহ্য করার পরিবর্তে সবাই যে আনন্দটুকু পাবে সেই আনন্দের কোনো তুলনা নেই। যারা আমার কথা বিশ্বাস করে না তারা চেষ্টা করে দেখতে পারে।

৩.

এই প্রসঙ্গে শেষ কথাটুকু বলে দেওয়া যাক, পৃথিবীতে যতভাবে আনন্দ পাওয়া সম্ভব তার মাঝে সবচেয়ে তীব্রভাবে সেটি পাওয়া যায় যখন অন্যের জন্যে কিছু একটা করা হয়। সিদ্ধেশ্বরি বয়েজ হাই স্কুলে গিয়ে আমি সেটা নিজের চোখে দেখেছি, বি-স্ক্যানের স্বেচ্ছাসেবকেরা সেখানে হাজির ছিল। তাদের আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না।

আমি দেশের তরুণদের এই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই, শুধু নিজের জন্যে বেঁচে থেকে কোনো আনন্দ নেই, বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ আনন্দ পেতে হলে অন্যের জন্যে কিছু একটা করতে হয়। তাই যারা বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ আনন্দটি কী সেটা জানতে চায় তাদেরকে বি-স্ক্যান বা এরকম অন্য কোনো একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু একটা করার জন্যে অনুরোধ করছি।

আমি এটা নিশ্চিতভাবে জানি, আমি অনয়ের মুখের হাসিটি নিজের চোখে দেখেছি।

ফিরে আসার আগে আমি সব শিশুদের অটোগ্রাফ দিয়ে এসেছিলাম-তাদেরকে যে কথা দিয়েছিলাম সেই কথাটি রেখে এসেছিলাম।

স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছর

আমি যখন এটা লিখছি তখন বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৪৪ বছরে পা দিয়েছে। একজন মানুষ যখন ৪৪ বছরে পা দেয় সে তখন পূর্ণবয়স্ক হয়ে যায়। দেশের জন্য সেটা সত্যি নয়, ৪৪ বছর একটা দেশের জন্য এমন কিছু বয়স নয়। আমাদের দেশের জন্য তো নয়ই, এই ৪৪ বছরের ভেতর ১৫ বছর ছিলো মিলিটারি শাসকদের কজায়-দেশের মন মানসিকতা তখন একেবারে উল্টোদিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের দেশ আসলে শূন্য থেকে শুরু করেনি, নেগেটিভ থেকে শুরু করেছে।

এই ৪৪ বছরেও দেশের কয়েকটা খুব বড় অপ্রাপ্তি রয়েছে, আমার ধারণা সেগুলো গুছিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারবো না। তার একটা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান। আমরা যারা স্বচক্ষে এই দেশটাকে জন্ম নিতে দেখেছি তারা জানি বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু প্রায় সমার্থক দুটি শব্দ।

বঙ্গবন্ধুর যদি জন্ম না হতো তাহলে আমরা সম্ভবত বাংলাদেশ পেতাম না। ১৯৭৫ সালে সেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে এই দেশে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হলো যেখানে বঙ্গবন্ধুর সঠিক অবস্থান দূরে থাকুক, এই মানুষটির অস্তিত্বই রীতিমত মুছে দেওয়া হলো। শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধুর নাম প্রথমবার রেডিও-টেলিভিশনে উচ্চারিত হতে শুরু করলো। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রচারণা এতো ব্যাপক আর পূর্ণাঙ্গ ছিল যে এখনো অনেকেই মনে করে যে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করে সে বুঝি আওয়ামী লীগের সমর্থক।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি অসম্মান দেখানোর বিষয়টা সবচেয়ে উৎকটভাবে দেখিয়েছেন খালেদা জিয়া, বঙ্গবন্ধুকে যেদিন সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে সেই দিনটিকে নিজের জন্মদিনের উৎসব করার দিন হিসেবে বেছে নিয়ে। আমাদের পারিবারিক একজনের জন্মদিন ঘটনাক্রমে নিজেদের অন্য একজনের মৃত্যুদিন হয়ে যাওয়ার কারণে জন্মদিনটি আর সেদিন পালিত হয় না। অথচ বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মানুষের সপরিবারে নিহত হওয়ার দিনটিতে বিছানার মতো বড় কেক কেটে জন্মদিনের উৎসব পালন করা যে কতো বড় রুচিহীন কাজ সেটি একটি রাজনৈতিক দল জানে না, সেটি বিশ্বাস করা কঠিন।

এই বিষয়টা থেকে একটা বিষয়ই শুধু নিশ্চিত হওয়া যায় যে বিএনপি (এবং তাদের সহযোগী দলগুলো) এখন বঙ্গবন্ধুকে তার যথাযথ সম্মান দিতে রাজী নয়। সত্যি কথা বলতে কী তাকে অসম্মান করাটা তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।

অথচ সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে বিএনপি দলটির জন্ম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর অনেক পরে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে বিএনপি কিংবা তাদের প্রতিষ্ঠাতা কোনো মানুষের সাথে তার কোনো বিরোধিতা হওয়ার কোনো সুযোগ পর্যন্ত ছিল না। তাহলে এই মানুষটিকে তাঁর যথাযথ সম্মান দেখাতে এই দলটির এতো অনীহা কেন ?

আমি রাজনীতির বিশ্লেষক নই, রাজনীতির অনেক মারপ্যাচ আমি বুঝি না। কিন্তু অন্তত এতোটুকু জানি যে, ‘কমন সেন্স’ দিয়ে যদি রাজনীতির কোনো একটা বিষয় বোঝা না যায় তাহলে সেখানে অনেক বড় সমস্যা আছে। তাই কোনো রাজনৈতিক দল যদি বাংলাদেশে রাজনীতি করতে চায়, অথচ সেটা করার জন্য এই দেশের স্থপতিকেই অস্বীকার করে তাহলে সেটা হচ্ছে ভুল রাজনীতি। ভুল রাজনীতি করলে একটা দল কতো দ্রুত ক্ষমতাহীন হয়ে যেতে পারে সেটা বোঝার জন্য কী আইনস্টাইন হতে হয়? হয় না। কাজেই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বিএনপিকে যদি এই দেশের রাজনীতিতে টিকে থাকতে হয় তাহলে তাদের সবার আগে বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা স্বীকার করে নিতে হবে।

আমরা সব সময়ই রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে সম্প্রীতির অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যদি দেশ, দেশের পতাকা, দেশের জাতীয় পতাকার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ দেশের স্থপতিকে নিয়েই বিভ্রান্তির মাঝে থাকে তাহলে তারা কোন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে ?

২.

এবারের স্বাধীনতা দিবসে লাখো কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া নিয়ে শুরুতেই একটা জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আমরা সবাই সেটা জানি। জটিলতাটি এসেছিলো ইসলামী ব্যাংকের অনুদান নিয়ে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো যে কুলাঙ্গারেরা তাদের সমর্থনপুষ্ঠ এই ব্যাংক কী করেছে সেটি তো কারো অজানা নেই! এই মূহুর্তে যে যুদ্ধাপরাধীর বিচার কাজ চলছে, সেই বিচার কাজকে থামানোর জন্যে দেশে-বিদেশে যে লবিস্ট লাগানো হয়েছে তাদেরকেও টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে এই ব্যাংক- আমাদের কাছে সে রকম গুরুতর অভিযোগ আছে। জামাতে ইসলামী নামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যে দলটি আছে তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে টাকা পয়সা আর ব্যবসা বাণিজ্য, এই ব্যাংটি দিয়েই সেই টাকা পয়সা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেই ব্যাংকটি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য টাকা দেবে আর সেই টাকায় আমরা ‘আমার সোনার বাংলা’ গাইব এটি যে কতো উৎকট একটি রসিকতা সেটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার জানে না সেটা বিশ্বাস করা কঠিন! কিন্তু সেটাই ঘটে গিয়েছিল। এই দেশের তরুণেরা প্রথমে এর বিরোধিতা করে সোচ্চার হয়েছিল, তারপর অন্যেরা। এই দেশের মানুষের প্রচণ্ড চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের টাকাটা তারা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য ব্যবহার করবে না।

এইটুকু হচ্ছে ভূমিকা। আমি এর পরের কথাটা বলার জন্যে এই ভূমিকাটুকু করেছি। সরকার ঘোষণা দিয়েছে ইসলামী ব্যাংকের টাকা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য ব্যবহার করা না হলেও টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ব্যবহার করা হবে! সরকারের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে এই দেশের তরুণ ছেলে মেয়েরা ইসলামী ব্যাংকের সাথে দুর্ব্যবহার করে ফেলেছে, ইসলামী ব্যাংক যেন সেই দুর্ব্যবহারে মনে কষ্ট না পায় সেজন্যে যেভাবে হোক সরকারের তাদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাতে হবে! তাই তাদের টাকাটা বাংলাদেশের আয়োজিত টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যবহার করা হবে।

বেশ কিছুদিন আগে যখন হলমার্ক চার হাজার কোটি টাকা চুরি করেছিল তখন আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন এটা এমন কিছু বেশি টাকা নয় ! (শুনে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম টাকা চুরি করার টার্গেট হিসেবে কতো টাকা রাখা যেতে পারে সেখানে এটা একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিল !) যদি চুরি করার জন্যেই হাজার কোটি টাকা খুব বেশি না হয় তাহলে ইসলামী ব্যাংকের মাত্র কয়েক কোটি টাকা কেন আমাদের দেশের জাতীয় একটা অনুষ্ঠানে নিতেই হবে? দেশের মানুষের রক্তমাখা টাকা তাদের ফিরিয়ে দিলে কী হত ? মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারকে জানতে হবে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি তাদের এই ভালোবাসা আর সহমর্মিতা এই দেশের অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে হতাশ করেছে-আমাকেও হতাশ করেছে।

৩.

শুরুতে বলেছিলাম দেশটাকে এগিয়ে নিতে হলে মূল কিছু বিষয়ে সবার একমত হতে হবে, বঙ্গবন্ধু যে এই দেশের স্থপতি সেটি হচ্ছে এরকম একটি বিষয়। এই দেশটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ করে পাওয়া একটি দেশ। তাই মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন নিয়ে এই দেশটি শুরু করা হয়েছিল সেই স্বপ্নকে ভিত্তি করে তার ওপর পুরো দেশটি দাঁড় করানো হবে, এই সত্যটিও সেরকম একটি বিষয়। আমরা আজকাল খুব ঘন ঘন গণতন্ত্র শব্দটি শুনতে পাই, যখনই কেউ এই শব্দটি উচ্চারণ করেন তখনই কিন্তু তাকে বলতে হবে এই গণতন্ত্রটি দাঁড় করা হবে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তির ওপরে। আমরা মুক্তিযদ্ধের ভিত্তি সরিয়ে একটা গণতন্ত্র তৈরি করব, সেই গণতন্ত্র এই দেশটিকে একটা সাম্প্রদায়িক দেশ তৈরি করে ফেলবে, সকল ধর্মের সকল বর্ণের সকল মানুষ সেই দেশে সমান অধিকার নিয়ে থাকতে পারবে না সেটা তো হতে পারে না। কাজেই ধর্ম ব্যবহার করে রাজনীতি করা গণতান্ত্রিক অধিকার বলে দাবি করা হলেও সেটি কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের সাথে খাপ খায় না। গত নির্বাচনের ঠিক আগে আগে নির্বাচন প্রতিহত করা আর যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রতিহত করার আন্দোলন যখন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল, তখন সন্ত্রাস কোন পর্যায়ে যেতে পারে সেটা দেশের মানুষের নিজের চোখে দেখার একটা সুযোগ হয়েছিল। সেই সন্ত্রাসের নায়ক ছিল জামাতে ইসলামী আর তার ছাত্র সংগঠন। একাত্তরে এই দলটি যুদ্ধাপরাধ করেছিল। চার দশক পরেও সেই যুদ্ধাপরাধের জন্য তাদের মনে অপরাধবোধ নেই, গ্লানি নেই, একাত্তরের সমান হিংস্রতা নিয়েই তারা এই দেশে তাণ্ডব করতে রাজী আছে।

আমি অবশ্যি এই লেখায় জামাতে ইসলামীর সন্ত্রাস নিয়ে কথা বলতে আসিনি। আমি কিছুদিন আগে দেখা খবরের কাগজের একটা রিপোর্টের কথা বলতে এসেছি। যেখানে লেখা হয়েছে উত্তরবঙ্গের কোনো একটি শহরে জামাতে ইসলামীর বড় একটা দল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে এসেছে। বিষয়টা কী এতই সহজ?

যে সারা জীবন জামাতে ইসলামী করে এসেছে, একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের জবাই করেছে, হিন্দুদের বাড়ি লুট করে তাদেরকে দেশছাড়া করেছে, এই কয়েক মাস আগেও পেট্রল বোমা দিয়ে সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে, হিন্দুদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে রাতারাতি তারা জামাতে ইসলামী থেকে আওয়ামী লীগ হয়ে গেল! তাদের সমস্ত মন মানসিকতা চিন্তা করার ধরন, আদর্শ স্বপ্ন একটা ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেল ? তারা এখন বঙ্গবন্ধুর অনুসারী, মুক্তিযুদ্ধের পতাকা বাহক? এটি কি করে সম্ভব ? আমাকে কি বুঝিয়ে দেবে ?

নাকি প্রকৃত ব্যাপারটা আরো ভয়ঙ্কর-জামাতে ইসলামীর কর্মীদের গ্রহণ করার জন্য আওয়ামী লীগকেই খানিকটা পাল্টে যেতে হবে? তাদের এখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বেশি বলা যাবে না, বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করতে হবে, হিন্দু ধর্মের মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে হবে, পেট্রল বোমা বানানো শিখতে হবে ? কেউ কী আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ? যে আদর্শকে আমরা এত গুরুত্ব দিয়ে নেই রাজনীতিতে সেটা আসলে একটা রঙ তামাশা ?

৪.

এই লেখাটি যখন লিখছি তখন খবর পেলাম খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান লন্ডনে ঘোষণা দিয়েছেন, তার বাবা জিয়াউর রহমান যেহেতু ‘স্বাধীনতার ঘোষণা’ দিয়েছিলেন তাই তিনিই হচ্ছেন দেশের ‘প্রথম’ প্রেসিডেন্ট!

ভাগ্যিস বেচারা জিয়াউর রহমান বেঁচে নাই, যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তার গুণধর ছেলের কথা বার্তা শুনে গলায় দড়ি দিতেন।

অভিভাবক যখন অভিশাপ

গত কয়েক সপ্তাহে আমার বেশ কিছু মন খারাপ করা অভিজ্ঞতা হয়েছে। একজন মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে যিনি তার মেয়েকে নিয়ে সবসময়ই এক ধরনের আতঙ্কে থাকেন। আতঙ্কটি উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, তার কারণ মেয়েটি বেশ কয়েকবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে। মেয়েটির বয়স বেশি নয়, জীবনের নানা ধরনের যে জটিলতা একজনকে আত্মহত্যার মতো ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপারের দিকে ঠেলে দেয়, মেয়েটির সেই বয়স হয়নি। মেয়েটি মাত্র স্কুলে পড়ে, এই বয়সে ছেলেমানুষি কল্পনা করেই সময় কেটে যাওয়ার কথা। মেয়েটির বেলায় তা ঘটেনি। কারণ, সে কোন বিষয়ে লেখাপড়া করবে সেটি নিয়ে তার বাবা-মা তার ওপর এমন চাপ দিয়েছেন যে, তার পক্ষে সে চাপ সহ্য করা সম্ভব হয়নি, হঠাৎ করে তার জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে। মা এখন মেয়েটিকে নিয়ে এক মানসিক ডাক্তার থেকে আরেক মানসিক ডাক্তারের কাছে ছুটে বেড়াচ্ছেন। অবাক হয়ে আবিষ্কার করছেন, একটা কম বয়সী কিশোরী মেয়ের নিজের ভেতরে দুর্ভেদ্য একটা দেয়াল তুলে রেখেছে, সেই দেয়াল ভেদ করে কেউ এখন ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।

আমি আরেকটি মেয়ের কথা জানি যে তার মায়ের প্রচণ্ড চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ঠিক করল সে আর বাড়িতে থাকবে না, তাই একদিন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। এটি একটি ভয়ঙ্কর গল্প হতে পারত, শেষ পর্যন্ত হয়নি। কারণ মেয়েটিকে বহুদূরের একটা এলাকা থেকে সময়মতো উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। মেয়েটি এখন কেমন আছে আমি জানি না। মাত্র কয়েকদিন আগে আমার অফিসে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাবার পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে ছেলেটি ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে পারেনি। তাই বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। ছেলেটি এখন আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত মানুষের করুণার ওপর নির্ভর করে দিন কাটাচ্ছে, টাকা ধার করে ফরম ফিলাপ করে কোনোভাবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। ছেলেটি আমার কাছে জানতে চেয়েছে, সে এখন কী করবে। আমি বেশ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, তাকে বাস্তব এবং কার্যকর কোনো উপদেশ দেওয়ার মতো আমি কিছু খুঁজে পাইনি!

এগুলো হচ্ছে মাত্র গত কয়েক সপ্তাহের উদাহরণ। আমি যদি আরও আগের অভিজ্ঞতার কথা মনে করার চেষ্টা করি, তাহলে এ রকম অসংখ্য ঘটনার কথা বলতে পারব। বাবা-মায়ের নির্দয় ব্যবহারে মানসিকভাবে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার উদাহরণ যে রকম আছে, ঠিক সে রকম বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজের নাম পাল্টে দ্বিতীয়বার এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে একেবারে নতুন করে একা একা নিজের জীবন শুরু করার উদাহরণও আছে।

কেউ যেন মনে না করে, আমি বলার চেষ্টা করছি আমাদের সব মা-বাবাই বুঝি এ রকম। আমি যে উদাহরণগুলো দিয়েছি সেগুলোর সংখ্যা আসলে খুবই কম। কিন্তু তারপরও এ রকম উদাহরণ যে কম হলেও আছে সেটাই আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ। দুশ্চিন্তাটুকু একটু বেশি, কারণ যতই দিন যাচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে এ রকম উদাহরণের সংখ্যা বাড়ছে। অনেক বাবা-মা কেন জানি খুব সহজ একটা বিষয় বুঝতে পারেন না, তাদের ছেলেমেয়েরা যত ছোটই হোক, তারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তাদের নিজেদের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং তাদের ওপর নিজেদের কোনো একটা সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিলে তার ফল কখনও ভালো হতে পারে না।

কয়েক বছর আগে টেলিভিশনের একটা চ্যানেল আমাকে একটা নিয়মিত অনুষ্ঠানে কিছুদিনের জন্য উপস্থিত হতে রাজি করিয়েছিল। শুক্রবার সকালবেলা আমি কিছুক্ষণের জন্য টেলিভিশনে 'লাইভ' বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতাম। বাচ্চারা আমার কাছে তাদের প্রশ্নগুলো পাঠাত, আমাকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হতো। সে সময় আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, এ দেশের শিশু-কিশোরের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যে বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে চায় সেখানে তাদের বাবা-মায়ের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে কিনা!

আমাকে খুব সাবধানে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। আমি তাদেরকে বলতাম, তাদের বাবা-মায়ের বয়স যেহেতু বেশি, তাই তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও বেশি। সেই অভিজ্ঞতার কারণে তারা কিছু কিছু বিষয় জানেন, যেগুলো শিশু-কিশোররা এখনও জানে না। তাই তাদের বাবা-মায়ের যুক্তিগুলো তারা শুনতে পারে। কিন্তু নিজের জীবনটা কীভাবে গড়ে তুলবে সেই সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদেরই নিতে হবে। আমি আমার জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নিয়েছি। আমার ছেলেমেয়ের বেলাতেও তারা কী নিয়ে লেখাপড়া করতে চায়, সেই সিদ্ধান্ত তাদের নিতে দিয়েছি। আমি মনে মনে আশা করি, সবারই জীবনে এই স্বাধীনতাটুকু থাকুক।

বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়ের একটা সুন্দর জীবন দেখতে চান। কিন্তু সেই সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখার জন্য তারা কতটুকু বাড়াবাড়ি করবেন, সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

বাবা-মায়েদের বাড়াবাড়ি কী পর্যায়ে যেতে পারে তার একটা উদাহরণ দিই। আমাদের স্কুল-কলেজে এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন হয় (যখনই সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে কথা হয়, তখন কেউ না কেউ বলে, 'কিন্তু আপনি কি জানেন, এখন সৃজনশীল প্রশ্নের গাইডবই বের হয়ে গেছে? আগে ছেলেমেয়েরা শুধু নিজের পাঠ্যবই মুখস্থ করত, এখন ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীল গাইডবইটাও মুখস্থ করতে হচ্ছে।' আমি তাদের মনে করিয়ে দিই, এই গাইডবই মুখস্থ করে তারা কখনোই কোনো সত্যিকারের পরীক্ষার একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারবে না! সত্যিকারের পরীক্ষায় কখনও কোনো প্রশ্ন এই গাইডবই

থেকে আসবে না। ছাত্রছাত্রীরা যদি তাদের পাঠ্যবই_ শুধু তাদের পাঠ্যবই আগাগোড়া মন দিয়ে পড়ে, তাহলেই তারা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে)। যাই হোক যখন প্রথমবার সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রশ্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হলো, তখন হঠাৎ করে তার বিরুদ্ধে এক ধরনের লেখালেখি শুরু হয়ে গেল। আমরা যারা এই পদ্ধতিটার গুরুত্বটুকু ধরতে পেরেছিলাম, তারাও সবাই মিলে এর পক্ষে কথা বলতে শুধু করলাম। তখন হঠাৎ একটা বিচিত্র বিষয় আবিষ্কার করলাম, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা যেভাবে হোক সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন। ঠিক কী কারণ জানি না, সেটা করার জন্য তারা সবাই মিলে আমাকে 'সাইজ' করার একটা প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন। দিন নেই, রাত নেই তারা আমাকে ফোন করেন, আমার সঙ্গে কথা বলেন, দল বেঁধে এখানে-সেখানে দেখা করেন, আমাকে নানা বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে কিছুদিনের মধ্যে আমি আসল ব্যাপারটি আবিষ্কার করলাম, তাদের যুক্তিটি খুবই চমকপ্রদ। তারা আমাকে বলেন, 'আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, এই পদ্ধতিটি খুবই ভালো। কিন্তু এই বছর আমার ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে। তারা পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে যাক, তারপর যা খুশি করেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই !'

যেসব অভিভাবক আমার জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলেছিলেন, তাদের মধ্যে একজনও নেই যার ছেলেমেয়ে সেই বছরের পরীক্ষার্থী নয়। দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিয়ে তাদের কারও কোনো মাথাব্যথা নেই, তাদের সব মাথাব্যথা শুধু নিজেদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। আমি তখন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, লেখাপড়ার বিষয় নিয়ে প্রবলভাবে সোচ্চার অভিভাবকরা আসলে খুব স্বার্থপর। তাদের নিজেদের সন্তানের ভালোমন্দের বাইরে তারা কখনও কিছু চিন্তা করেন না। স্বার্থপর মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেয়ে নিরানন্দ কাজ কিছু হতে পারে না। তাদের কথাবার্তাকে গুরুত্ব দিয়ে নেওয়ারও কোনো প্রয়োজন হয় না।

২.

স্বার্থপর অভিভাবক থেকেও ভয়ঙ্কর এক ধরনের অভিভাবক আছেন। তাদের সঙ্গে সাধারণত আমার দেখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পর। এবারে একজন আমার অফিসে এসেছেন। তার সঙ্গে একজন কম বয়সী তরুণ, চেহারা দেখে অনুমান করতে পারলাম, সে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় সে রকম একজন। বয়স্ক ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, সেটা বুঝিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে হাত মেলালেন এবং আমি তাদের সামনে বসার আমন্ত্রণ জানালাম। ভদ্রলোক আমাদের এলাকার মানুষ বলে পরিচয় দিয়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন। আমাকে জানালেন, তার সঙ্গের ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে পারেনি, তাকে ভর্তি করে দিতে হবে।

'অমুক' বিভাগে ভর্তি হয়েছে, তখন তাকে আপনার বিভাগে ভর্তি করে দিতে হবে এ রকম অনুরোধ মাঝে মধ্যে শুনতে পাই; কিন্তু ভর্তি পরীক্ষাতেই টিকতে পারেনি তাকে ভর্তি করে দিতে হবে_ এই অনুরোধটি নতুন। আমি এ ধরনের অন্যায় কাজ করতে পারি_ লোকজন সেটা বিশ্বাস করে জানতে পেরে অবশ্যই আমার খুব আশাভঙ্গ হলো, আমার খুব মেজাজ খারাপ হলো; কিন্তু তারপরও আমাকে জোর করে মুখে হাসি ধরে রেখে বলতে হলো, এ রকম কিছু করা সম্ভব না। সত্যি কথা বলতে কি, কেউ যদি এটা করার চেষ্টাও করে, তারপরও সেটি করার উপায় নেই। মেধা তালিকায় যারা আছে তাদের একজন একজন করে ভর্তি করা ছাড়া আমাদের সিস্টেম আর কিছু করতে পারবে না।

ভদ্রলোক আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, হেসে হেসে বললেন, এ দেশে সবকিছু সম্ভব। আপনার দেশের একজন মানুষের জন্য আপনার এটা করে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেশ কিছুক্ষণ এ ধরনের আলাপ চলল, আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে পাশাপাশি বসে থাকা এই কম বয়সী তরুণ এবং তার অভিভাবকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক পর্যায়ে আমাকে কঠিন হতে হলো, রূঢ় ভাষায় বলতে হলো যে এই ছেলেটি আপনার পাশে বসে বসে দেখছে তাকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য চেষ্টা চলছে! আপনার সম্পর্কে এখন ছেলেটির কী ধারণা হচ্ছে? সে জানছে, তার অভিভাবক একজন ক্রিমিনাল- এসেছে আরেকজন ক্রিমিনালের কাছে ?

ভদ্রলোক অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন এবং বিরক্ত হয়ে বিদায় নিলেন। আমার ভেতরটা সারাদিনের জন্য তেতো হয়ে গেল। এ ধরনের অভিভাবকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তাদের ছেলেমেয়েদের সামনে তারা অন্যায় কাজ করে ফেলেন, ছেলেমেয়েদের বোঝান কোনো কিছু পাওয়ার জন্য অন্যায় করতে হয়। সৎ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যেটা পাওয়ার কথা সেটা পেলেই হলো। এ ব্যাপারে খুব ছেলেমানুষি একটা ব্যাপার আমার ভেতরে বেশ দাগ কেটেছে। আমি বইমেলায় বসে আছি, শত শত ছেলেমেয়ে ভিড় করে আমার অটোগ্রাফ নিচ্ছে। যখন দেখলাম এটা ম্যানেজ করা যাচ্ছে না, তখন আমি তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিলাম। কিছুটা হলেও একটু শৃঙ্খলা ফিরে এলো, তারপরও যে হুটোপুটি নেই তা নয়। তখন হঠাৎ করে একজন ভদ্রমহিলা তার ছেলেকে লাইনের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'এর বইয়ে একটা অটোগ্রাফ দিয়ে দিন।' আমি ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি সবার মতো লাইন ধরে এসেছ?' মা ছেলেটিকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না, বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ সে লাইন ধরে এসেছে।' আমি আবার ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি তুমি লাইনে ছিলে?' ছেলেটি কিছু বলতে পারল না, মা আবার বললেন, সে লাইনেই ছিল, লাইন ভেঙে ঢোকেনি। আমি নিজের চোখে দেখেছি কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে এই ছোট বিষয় নিয়ে নাটক করার চেষ্টা না করে ছেলেটির বইয়ে অটোগ্রাফ দিয়ে তাকে বললাম, 'আমি দেখেছি, তুমি লাইন ভেঙে ঢুকেছ! কেন এটা করলে ?'

ছেলেটির মুখ মুহূর্তে অপমানে ম্লান হয়ে গেল। তীব্র চোখে তার মায়ের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি করতে চাইনি। আমার মা আমাকে করিয়েছে।'

আমি শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'এরপর থেকে মা করাতে চাইলেও করবে না, ঠিক আছে ?'

শিশুটি চোখের পানি আটকে রেখে মাথা নেড়ে সায় দিল। আমার ধারণা, যখন একটি শিশু জন্ম নেয়, তখন তারা অন্যায় করতে জানে না। অন্যায় করার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, বাবা-মা কিংবা অভিভাবক যখন তাদের সন্তানের সামনে অন্যায় করেন, সন্তানকে অন্যায় কাজ করতে শেখান, তখন তারা সেটা করতে শেখে। সুন্দর একটা মন ধীরে ধীরে দূষিত হয়ে যায়।

আমাদের দেশের মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার কিছু কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আছে। তারা অভিভাবক এবং তাদের সন্তানদের এক জায়গায় নিয়ে আসে। অভিভাবকদের খাওয়া এবং ঘুমের ব্যবস্থা থাকে, যখন পরীক্ষার্থীরা রাত জেগে ফাঁস করে আনা মেডিকেলের প্রশ্ন মুখস্থ করতে থাকে। ছেলেমেয়েরা জানে তাদের বাবা-মায়েরা কয়েক লাখ টাকা দিয়ে তাদেরকে ফাঁস করে আনা প্রশ্ন মুখস্থ করার সুযোগ দিয়েছে। সেটা নিয়ে তাদের বিবেক কোনো যন্ত্রণা দেয় কিনা আমার জানা নেই। টাকা দিয়ে তারা অনেক বড় অন্যায় করছে কিন্তু সেই বাবা-মা কীভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের চোখের দিকে তাকান, আমি জানি না। আমার খুব জানার ইচ্ছে !

এ রকম একটা মন খারাপ করা কুৎসিত বিষয় লিখতে আমার খুব খারাপ লাগছে; কিন্তু আমি সেটা মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারি। কারণ প্রতিদিনই আমার খাঁটি অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা গভীর ভালোবাসা দিয়ে তাদের সন্তানদের বড় করছেন। সন্তানের শখ পূরণ করার জন্য নিজের সময় দিচ্ছেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়ার উৎসবে বাবা-মায়েরা কষ্ট করে তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসেন। গণিত, বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান_ এ ধরনের অলিম্পিয়াডে যোগ দেওয়ার জন্য সন্তানদের উৎসাহ দিচ্ছেন। ছবি আঁকার উৎসবে নিয়ে যাচ্ছেন; ছেলেমেয়েদের দেশকে ভালোবাসতে শেখাচ্ছেন, মানুষকে ভালোবাসতে শেখাচ্ছেন। আমি হতদরিদ্র অশিক্ষিত বাবা-মায়েদের দেখেছি, যারা সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য নিজের জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছেন। আমি জানি, আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু যখন দেখি একটা তরুণ শুকনো মুখে আমাকে বলে, ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি বলে তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, তখন আমার পরিচিত জগৎটি এলোমেলো হয়ে যায়। যখন শুনি বাবা-মায়ের প্রচণ্ড চাপে একটি মেয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছে কিংবা বাড়ি থেকে পালিয়ে একটা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে, আমি তখন আতঙ্কে শিউরে উঠি। আমার এই লেখাটি

সে ধরনের কোনো অভিভাবকদের চোখে পড়বে কিনা জানি না। যদি পড়ে তাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনাদের জীবনের অপূর্ণ স্বপ্ন আপনাদের সন্তানদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। তাদেরকে তাদের নিজেদের স্বপ্ন দেখতে দিন। তাদের ওপর বিশ্বাস রাখেন। তাদেরকে জোর করে একটা প্রতিযোগিতা থেকে অন্য একটা প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেবেন না। তাদেরকে সবকিছু অর্জন করতে বাধ্য করবেন না। তারা যে কাজটুকু করতে আনন্দ পায় সেই কাজটুকু করতে দিন।

আমাদের একটি মাত্র জীবন, সেই জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অংশটুকু হচ্ছে শৈশব। তাদের শৈশবটিকে বিষাক্ত করে দেবেন না। তাদেরকে একটা আনন্দময় শৈশব নিয়ে বড় হতে দিন। তাদেরকে সবকিছু অর্জন করতে হবে না, সবকিছুতে পুরস্কার পেতে হবে না, তাদেরকে জীবনটা উপভোগ করতে হবে। তাদেরকে জীবনটা উপভোগ করতে দিন।

যেসব অভিভাবক তাদের সন্তানদের অন্যায় কাজ করতে ঠেলে দিচ্ছেন তাদেরকে কী বলব আমি জানি না। তারা কীভাবে তাদের সন্তানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি এই গুরুতর অপরাধটি করো।' এ রকম কোনো একজন অভিভাবক কি আমাকে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন?

অভিভাবকরা সন্তানদের ভালোবাসা দেবেন, তাদের জীবনে তারা কেন অভিশাপ হয়ে যাবেন ?

কান পেতে রই

আমি তখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন যোগ দিয়েছি। একদিন বিকেলে আমার বিভাগের একজন ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, ছাত্রটির উদভ্রান্তের মতো চেহারা, শূন্য দৃষ্টি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আমার আত্মহত্যা করার ইচ্ছে করছে!' ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' ছাত্রটি কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। শুধু বুঝতে পারলাম কোনো একটা দুর্বোধ্য কারণে সে তীব্রভাবে হতাশাগ্রস্ত, মানসিকভাবে পুরোপুরি বিপর্যস্ত। কীভাবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বা হতাশাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের হতাশা থেকে টেনে বের করে আনতে হয়, আমার জানা নেই। শুধু কমনসেন্স ব্যবহার করে আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি, তাকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করেছি, শক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সে যখন চলে যাচ্ছে আমি তখন তাকে বলেছি, 'তোমার আবার যদি কখনও আত্মহত্যা করার ইচ্ছে করে আমার কাছে চলে এসো।'

ছেলেটি মাঝে মধ্যেই আসত। শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলত, 'স্যার আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে।' আমি তখন তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম, সাহস দিতাম। ছাত্রটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেনি- পাস করে বের হয়েছে। কিন্তু আমার একটি ছাত্রী আত্মহত্যা করেছিল - এতদিন হয়ে গেছে আমি তবু সেই ঘটনাটির কথা ভুলতে পারি না। এখনও যখন কোনো একটি ছাত্র বা ছাত্রী আমার অফিসে ঢুকে শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'স্যার, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে' আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমি জানি, সাহস করে কিংবা মরিয়া হয়ে যে একজন-দু'জন ছাত্রছাত্রী আমার কাছে আসে তার বাইরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আছে, যারা কোনো কারণ ছাড়াই হতাশাগ্রস্ত, নিঃসঙ্গ কিংবা আত্মহত্যাপ্রবণ। তারা কী করবে বুঝতে পারে না, কোথায় সাহায্য পাবে জানে না। আমাদের সবার অজান্তে তারা বিচিত্র এক ধরনের যন্ত্রণায় ছটফট করে। একজন শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে তাকে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার কথা আমরা সবাই জানি। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলেও তাকে যে একটু সেবা দিয়ে স্বাভাবিক করে তুলতে হয়, সেটা কিন্তু আমরা এখনও জানি না। আজকে আমার এই লেখাটি লিখতে খুব আনন্দ হচ্ছে। কারণ, কিছু তরুণ-তরুণী মিলে এ দেশে মানসিক সেবা দেওয়ার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'কান পেতে রই' এবং এই সপ্তাহে এ প্রতিষ্ঠানটির এক বছর পূর্তি হবে। এই এক বছর তারা অসংখ্য হতাশাগ্রস্ত-নিঃসঙ্গ-বিপর্যস্ত মানুষকে টেলিফোনে মানসিক সেবা দিয়েছে। আত্মহত্যা করতে উদ্যত মানুষকে শান্ত করে নতুন জীবন উপহার দিয়েছে। আজকে আমি এই প্রতিষ্ঠানটিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য লিখতে বসেছি।

টেলিফোনে মানসিক সেবা দেওয়ার ব্যাপারটি আমি যখন প্রথম শুনেছিলাম, তখন একটু অবাক হয়েছিলাম। এটি কীভাবে কাজ করে আমি বুঝতে পারছিলাম না। এর পেছনের কাহিনীটি খুবই চমকপ্রদ। সেটা জানার পর আমি প্রথমবার বুঝতে পেরেছি এটা কীভাবে কাজ করে। যুক্তরাজ্যের এক ধর্মযাজকের কোনো একজন কাছের মানুষ হঠাৎ আত্মহত্যা করেছিল। ধর্মযাজক মানুষটি কোনোভাবে এটা মেনে নিতে পারলেন না। তখন তিনি ঠিক করলেন, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, হতাশাগ্রস্ত মানুষদের তিনি বোঝাবেন, সাহস দেবেন, শক্তি দেবেন, সান্ত্বনা দেবেন। সত্যি সত্যি একদিন কাজটি শুরু করেছিলেন এবং দেখতে দেখতে অনেক মানুষ তার কাছে সাহস-সান্ত্বনা-উপদেশ আর শক্তি পেতে আসতে শুরু করল। কিছু দিনের ভেতর ধর্মযাজক আবিষ্কার করলেন, এত মানুষ তার কাছে আসতে শুরু করেছে যে তিনি আর কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ওয়েটিং রুমে অসংখ্য মানুষ বসে থাকে। ধর্মযাজক মানুষটি তখন কিছু ভলান্টিয়ারকে ডেকে নিয়ে এলেন, যারা ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করা মানুষদের একটু চা-কফি খেতে দেবে, তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে অপেক্ষা করার সময়টুকু কাটানোর জন্য সাহায্য করবে। কয়দিনের ভেতর ধর্মযাজক অত্যন্ত বিচিত্র একটি বিষয় আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন, যারা তার সঙ্গে কথা বলতে আসছিল হঠাৎ করে তাদের আর তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে না। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেই তারা খুশি হয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। ধর্মযাজক হঠাৎ করে বুঝতে পারলেন, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এই মানুষগুলো আসলে কোনো উপদেশ শুনতে আসে না, তারা আসলে তাদের বুকের ভেতর আটকে থাকা অবরুদ্ধ যন্ত্রণার কথা বলেই ভারমুক্ত হতে চায়। কোনো একজন মানুষ যদি গভীর মমতা দিয়ে একজন হতাশাগ্রস্ত বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষের কষ্টের কথাটি শোনে, তাহলে তাদের অনেকেই মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। ধর্মযাজক এই অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ তথ্যটি আবিষ্কার করে ১৯৫২ সালে লন্ডনে টেলিফোনে মানসিক সেবা দেওয়ার একটি হেল্পলাইন বসিয়েছিলেন। সেখানে কিছু ভলন্টিয়ার নেশাগ্রস্ত, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কিংবা আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষের কথা শুনত। তারা নিজে থেকে কোনো উপদেশ দিত না, যারা তাদের যন্ত্রণার কথা, কষ্টের কথা বলত, সেই মানুষজন কথা বলতে বলতে আবিষ্কার করত তাদের যন্ত্রণা কমে আসছে। একজন মানুষ গভীর মমতা দিয়ে তার দুঃখের কথা শুনছে- সেখান থেকেই তারা সান্ত্বনা খুঁজে পেত। পদ্ধতিটি এত সহজ, এত সুন্দর এবং এত সফল যে পৃথিবীর ৪০টি দেশে এ রকম মানসিক সেবা দেওয়ার হেল্পলাইন রয়েছে। 'কান পেতে রই' দিয়ে বাংলাদেশ হচ্ছে ৪১তম দেশের ৪১তম প্রতিষ্ঠান। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় থেকে ৪০টিরও বেশি দেশে এই হেল্পলাইনগুলো কাজ করে যাচ্ছে। তাই কীভাবে এটা দিয়ে কাজ করানো যায় সেটি অজানা কিছু নয়। যারা 'কান পেতে রই' দাঁড় করিয়েছে তাদের একজন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মানসিক সেবা দেওয়ার হেল্পলাইনে প্রায় তিন বছর কাজ করে এসেছে। সারা পৃথিবীতেই যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয়, এখানেও তাই। এই কাজটি করে ভলান্টিয়াররা; কিন্তু এরা কেউ সাধারণ ভলান্টিয়ার নয়। অনেক যাচাই-বাছাই করে তাদেরকে নেওয়া হয়। তারপর সবাইকে একটা দীর্ঘ প্রশিক্ষণের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যারা সফলভাবে পুরো প্রক্রিয়াটার ভেতর দিয়ে যেতে পারে, তারাই এই হেল্পলাইনে টেলিফোনের সামনে বসতে পারে। যে ব্যক্তি ফোন করে সাহায্য নিতে চায়, তাকে তার নিজের পরিচয় দিতে হয় না।

সে যে সমস্যার কথাটি বলে সেটি পুরোপুরি গোপন রাখা হয়। পৃথিবীর আর কেউ সেটি জানে না। আমার কাছে যেটি সবচেয়ে চমকপ্রদ মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে, 'কান পেতে রই' প্রতিষ্ঠানটিতে যে ভলান্টিয়াররা কাজ করে তাদের পরিচয়ও বাইরের কাউকে জানানো হয় না। একশ' দিন পূর্তি হওয়ার পর তারা একটি অনুষ্ঠান করেছিল। সেখানে কয়েকজন ভলান্টিয়ার উপস্থিত দর্শকদের সামনে কথা বলেছিল; কিন্তু কথা বলেছিল পর্দার আড়াল থেকে। সাদা স্ক্রিনে শুধু তাদের ছায়া দেখা গেছে।

আমাকে অবশ্য এই ভলান্টিয়ারদের পর্দার আড়াল থেকে দেখতে হয় না, আমি তাদের অনেককেই চিনি। আমি নিজেও ভাবছি, কোনো এক সময় ভলান্টিয়ার হওয়ার প্রশিক্ষণটুকু নিয়ে নেব। হেল্পলাইনের টেলিফোনের সামনে বসার মতো সাহস আমার নেই, যখন কোনো একজন ছাদে রেলিংয়ের ওপর দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে ফোন করবে কিংবা একগাদা ঘুমের ওষুধ হাতে নিয়ে টেলিফোন ডায়াল করবে কিংবা ধারালো ব্লেড হাতে নিয়ে শরীরের কোনো একটা ধমনি কেটে ফেলার হুমকি দেবে, তখন তাদের সঙ্গে কথা বলে বলে শান্ত করে আনার মতো আত্মবিশ্বাস আমার নেই। কিন্তু অন্তত আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কেউ যদি উদভ্রান্তের মতো আমার কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে আসে, তখন কীভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে সেটুকু হয়তো আরেকটু ভালো করে জানব। 'কান পেতে রই' সম্পর্কে জানার পর এর মাঝেই আমার একটা বড় লাভ হয়েছে। আগে যখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কেউ আসত, আমার ভেতর একটা ধারণা কাজ করত যে, তাকে বুঝি কিছু উপদেশ দিতে হবে। এখন আমি জানি, কোনো উপদেশ না দিয়ে শুধু যদি তাদের কথা একটু মমতা দিয়ে শুনি, তাহলেই তাদের অনেক বড় উপকার হয়। আমি সেটা ঘটতে দেখেছি।

'কান পেতে রই' প্রতিষ্ঠানটির ভলান্টিয়াররা যেহেতু ঘোষণা দিয়েছে তারা কখনোই সাহায্যপ্রার্থীর পরিচয় বা সমস্যার কথা কাউকে বলবে না, তাই বাইরের কেউ সেটি জানতে পারবে না। বড়জোর একটা পরিসংখ্যান পেতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো গবেষণার বিশাল একটা উপাত্ত হতে পারে।

তাদের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমি পুরো প্রক্রিয়াটির রুদ্ধশ্বাস এবং নাটকীয় অংশটুকু অনুভব করতে পেরেছি। আত্মহত্যা করতে উদ্যত কোনো একজন মানুষের সঙ্গে যখন কোনো ভলান্টিয়ার দীর্ঘ সময় কথা বলে তার উত্তেজিত স্নায়ুকে শীতল করে আনে, তার আশাহীন অন্ধকার জগতের মাঝে ছোট একটা প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটি নামিয়ে রাখে, তখন অনেক সময়ই ভলান্টিয়াররা নিজেরাই হতচকিত, বিচলিত, ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। অন্য ভলান্টিয়াররা তখন তাকে ঘিরে রাখে, তাকে এক কাপ চা তৈরি করে খাওয়ায়, পিঠে থাবা দেয়! আমি সবিস্ময়ে এই ভলান্টিয়ারদের দেখি। তার কারণ এদের মাঝে এক-দু'জন চাকরিজীবী থাকলেও সবাই কম বয়সী তরুণ-তরুণী। বেশিরভাগ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমি আমার জীবনে একটা সত্য আবিষ্কার করেছি, সেটি হচ্ছে- বড় কিছু করতে হলে সেটি ভলান্টিয়ারদের দিয়ে করাতে হয়, যে ভলান্টিয়াররা সেই কারণটুকু হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস

করে। কাজেই মানসিক সেবা দেওয়ার এই কাজটুকুও আসলে ভলান্টিয়াররা করে। অন্য সব প্রতিষ্ঠানের ভলান্টিয়ারদের থেকে 'কান পেতে রই'-এর ভলান্টিয়াররা একটু ভিন্ন। কারণ তাদের পরিচয় কেউ কখনও জানতে পারবে না। তারা কাজ করে সবার চোখের আড়ালে। আত্মহত্যা করতে উদ্যত যে মানুষটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা না করে নিজের জীবনে ফিরে গেছে, সেও কোনোদিন জানতে পারবে না কোন মানুষটির কারণে সে বেঁচে আছে। কোনোদিন তার হাত স্পর্শ করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবে না। এটি একটি অসাধারণ ব্যাপার! আমি মুগ্ধ হয়ে তাদের দেখি। তাদের দেখে আমি এ দেশের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস পাই। পৃথিবীর যেসব দেশে মানসিক হেল্পলাইন পুরোপুরি চালু আছে, সেখানে এটি সপ্তাহের সাত দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। 'কান পেতে রই' সে রকম পর্যায়ে যেতে পারেনি। এটি সপ্তাহের পাঁচদিন একটা নির্দিষ্ট সময় চালু থাকে। ধীরে ধীরে তারা তাদের সময় বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তাদের ভলান্টিয়ারের সংখ্যা অর্ধশতাধিক, ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হলে ভলান্টিয়ারের সংখ্যা আরও অনেক বাড়াতে হবে। তারা ধীরে ধীরে সেই কাজ করে যাচ্ছে। আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে তারা হয়তো সেটা আরও দ্রুত করতে পারত। সপ্তাহের সাতদিন পুরো ২৪ ঘণ্টা ভলান্টিয়াররা হয়তো থাকতে পারে না; কিন্তু যখন তাদের থাকার কথা তখন তারা সবাই থাকে। এ দেশটি যখন হরতাল আর সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত হয়েছিল, তখনও তারা হাজির ছিল। তারা ঈদের দিনও হাজির ছিল, পূজার ছুটিতেও হাজির ছিল। মানসিক সেবা দিতে আসার সময় তারা ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছে, সাইকেলে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, কোনো যানবাহন না পেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে হেঁটে এসেছে। কিন্তু কখনও কেউ অভিযোগ করেনি। কোনো পত্রিকায় তাদের ছবি ছাপা হবে না, কোনো টেলিভিশনে তাদের দেখা যাবে না; কিন্তু কখনও তাদের মুখের হাসিটি বন্ধ হয়নি! এই মুহূর্তে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষজনকে সাহায্য করে যাচ্ছে। এক সময় তারা বড় হবে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে তারা দায়িত্ব নেবে। তখনও তারা নিশ্চয়ই সেখানে অন্য সবার থেকে ভিন্ন হবে- আমি সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছি !

'কান পেতে রই' সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানি। কারণ আমার পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য এদের সঙ্গে যুক্ত। তারা যখন তাদের কাজ শুরু করে, তখন খুব বড় গলায় আমাদের বলেছিল, 'আমরা তোমাদের মতো বড় বড় মানুষের কোনো সাহায্য না নিয়ে এটা দাঁড় করাব।' প্রথমেই তারা আটকা পড়েছিল। রিকশায় ঘোরা দুটি কম বয়সী মেয়েকে ঢাকা শহরের কোনো বাড়িওয়ালা বাসা ভাড়া দিতে রাজি হওয়া দূরে থাকুক কথা বলতেই রাজি হননি ! কাজেই বাসা ভাড়া করার জন্য আমাদের মতো বড় মানুষদের একটি-দুটি টেলিফোন করতে হয়েছিল ! এরপর তারা আর কখনও আমাদের সাহায্য নেয়নি। কোনো একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটা কেক বা সদ্য প্রকাশিত একটা বইয়ের বান্ডিল নিয়ে গেলে ভিন্ন কথা, সেগুলো নিয়ে তাদের উচ্ছ্বাসের কোনো অভাব নেই। আমি পত্রপত্রিকায় লিখি, সবসময় খারাপ খারাপ বিষয় নিয়ে লিখতে ভালো লাগে না, সুন্দর কিছু নিয়ে লিখতে ইচ্ছে করে। আমি 'কান পেতে রই'-এর এই উদ্যোগ নিয়ে লিখতে চেয়েছিলাম। একই পরিবারের সদস্য রয়েছে বলে তারা অনুমতি দেয়নি! এখন আমার পরিবারের সদস্য এখানে নেই; কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি আছে। শুধু তাই নয়, পুরো এক বছর তারা সফলভাবে

কাজ করে গেছে। তাই এবারে যখন 'কান পেতে রই'কে নিয়ে লিখতে চেয়েছি তারা আনন্দ এবং আগ্রহ নিয়ে রাজি হয়েছিল। আমি তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তাদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কিছু কি তারা সবাইকে জানাতে চায়। তারা বলেছে, শুধু তাদের সেবা দেওয়ার সময় এবং তাদের টেলিফোন নম্বরগুলো জানালেই হবে। এই মুহূর্তে তাদের প্রচারের পুরো কাজটুকু হয় সামাজিক নেটওয়ার্ক কিংবা লিফলেট বিতরণ করে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ায় তাদের বাজেট নেই। বয়স কম বলে তারা এখনও আপস করতে শেখেনি। তাই আদর্শের মিল নেই বলে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় তাদের ওপর ফিচার করতে চাইলেও তারা রাজি হয় না। কাজেই যারা কম্পিউটারের নেটওয়ার্কে নেই, তাদের বেশিরভাগই এই চমৎকার উদ্যোগটার কথা জানে না। যারা খবরের কাগজ পড়ে তাদের মাঝে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কেউ যদি থাকে, তাহলে হয়তো তারা একটুখানি সাহায্যের খোঁজ পেতে পারে। কাজেই আমি 'কান পেতে রই'-এর সময় সূচি আর টেলিফোন নম্বরটুকু দিয়ে দিচ্ছি :

রোববার থেকে বুধবার, দুপুর ৩টা থেকে রাত ৯টা। বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টা থেকে ভোর ৩টা। টেলিফোন নম্বরগুলো হচ্ছে_ ০১৭৭৯৫৫৪৩৯১, ০১৭৭৯৫৫৪৩৯২, ০১৬৮৮৭০৯৯৬৫, ০১৬৮৮৭০৯৯৬৬, ০১৯৮৫২৭৫২৮৬ এবং ০১৮৫২০৩৫৬৩৪।

গত বইমেলায় আমি এই প্রতিষ্ঠানের ভলান্টিয়ারদের একটা বই উৎসর্গ করেছিলাম। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলাম_ 'তোমরা কিছু তরুণ-তরুণী মিলে নিঃসঙ্গ, বিপর্যস্ত, হতাশাগ্রস্তদের মানসিক সেবা দেবার জন্যে একটা হেল্পলাইন খুলেছ। এমনকি আত্মহত্যা করতে উদ্যত কেউ কেউ শেষ মুহূর্তে তোমাদের ফোন করেছিল বলে তোমরা তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছ। আমি আমার সুদীর্ঘ জীবনে কখনো কারো জীবন বাঁচাতে পারিনি; কিন্তু তোমরা এই বয়সেই মানুষের জীবন বাঁচাতে পার - কী আশ্চর্য !'

আসলেই- 'কী আশ্চর্য !'

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ

এই নিয়ে পর পর তিনবার আমি একই বিষয় নিয়ে লিখছি, বিষয়টি হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস। প্রথমবার আমি ফাঁস হওয়া প্রশ্ন আর এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন পাশাপাশি বসিয়ে পত্র-পত্রিকায় পাঠিয়েছি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার এরকম অকাট্য একটা প্রমাণ পাবার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কিছু একটা করতে হবে বলে আমার ধারণা ছিল। আমার ধারণাটা ভুল ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু করেনি। আমি দ্বিতীয়বার তাই আরেকটু বড় করে লিখেছি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সরাসরি কয়েকটা প্রশ্নও করেছি, তারা আমাকেই তার উত্তর দিবে আমি সেটা কখনো ভাবিনি। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে সেটা অন্তত মেনে নিবে এরকম আশা ছিল। আমার আশা পূরণ হয়নি, হয়তো লেখাটা তাদের চোখে পড়েনি। এবারে তাই লেখার শিরোনামে 'শিক্ষামন্ত্রী' কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছি, নিশ্চয়ই কারো চোখে পড়বে। আমার অবশ্য আরো একটা উদ্দেশ্য আছে এই দেশের যে অসংখ্য ছেলে মেয়ে এই মুহূর্তে এইচএসসি পরীক্ষা নামে প্রহসনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে আমি তাদেরকে জানাতে চাই, সেই প্রহসনের জন্য আমাদের কারো বুকের মাঝে আত্মতৃপ্তি নেই, তারা যেরকম হতাশা, ক্ষোভ আর যন্ত্রণায় ছটফট করছে আমরাও ঠিক একইভাবে হতাশা ক্ষোভ আর যন্ত্রণায় ছটফট করছি।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে আমি প্রথম যে লেখাটা লিখেছিলাম তখন আমার হাতে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলো ছিল। এখন রসায়নের প্রশ্ন আছে। এগুলোও আমি পত্র-পত্রিকায় দিতে পারতাম কিন্তু কোনো লাভ হবে না বলে নোংরা ঘাটাঘাটি করতে ইচ্ছে করছে না। সবচেয়ে বড় কথা ফেসবুক থেকে যখন যার প্রয়োজন এগুলো নামিয়ে নিতে পারবে আমার দেয়া না দেয়াতে কিছু আসে যায় না।

একটা ব্যাপার আমার কাছে এখনো রহস্যের মত মনে হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি খুবই ভয়ানক একটা ব্যাপার। আমি ভেবেছিলাম এটা নিয়ে বুঝি সারা দেশে তুলকালাম ঘটে যাবে কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম কিছুই ঘটেনি। পত্র-পত্রিকার বা মিডিয়ার যে সব মানুষজনকে আমি চিনি তাদেরকে ফোন করে আমি ব্যাপারটা জানতে চাইলাম তারাও ব্যাপারটা আমাকে বোঝাতে পারলেন না। আচ্ছা আচ্ছা ভাবে মনে হল সবাই ধরেই নিয়েছে এরকমই ঘটতে থাকবে এবং যেহেতু চেঁচামেচি করে কিছুই হবে না, তাহলে খামোকা চেঁচামেচি করে কী হবে? কি সর্বনাশা কথা! আমিও ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করতে পারি, যে দেশে সরকারের র‌্যাব বাহিনী সরকারের পুরো প্রশাসনকে ব্যবহার করে এক দুইজন নয় সাত সাতজন নিরপরাধ মানুষকে প্রকাশ্য দিনের বেলায় সবার সামনে ধরে নিয়ে খুন করে নদীর তলায় ডুবিয়ে রাখতে হাত লাগায় সেই দেশে কী এখন 'তুচ্ছ' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে বিচলিত হবার সময় আছে ?

তারপরেও আমার মনে হয় আমাদের বিচলিত হতে হবে। তার কারণ একজন তরুণ কিংবা-তরুণী যদি তার স্বপ্ন দেখার বয়সটিতেই আশাহত হয়, হতাশাগ্রস্ত হয়, অপমানিত হয়, ক্ষুব্ধ হয় কোনো কারণ ছাড়াই তীব্র অপরাধবোধে ভুগতে থাকে তাহলে সে কেমন করে বেঁচে থাকবে? এইচএসসি-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে শুরু করার পর অসংখ্য ছেলে মেয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে তাদের ক্ষোভ-অভিযোগ-হতাশা আমাকে জানিয়েছে। আমি এর আগে সবসময়েই সবাইকে আশার কথা শুনিয়ে এসেছি, এই প্রথমবার আমি পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারছি না। আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন ই-মেইল পাঠিয়েছে একজন ছাত্রী। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পরও সে নিজের সততার কাছে মাথা উঁচু করে থেকেছেন। ফাঁস হওয়া প্রশ্ন সে দেখেনি, নিজের মত করে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা দেওয়ার পর জানতে পেরেছে তার চারপাশের সবাই ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, সবার পরীক্ষা 'ভালো' হয়েছে—শুধু তার পরীক্ষা ভালো হয়নি, প্রশ্নপত্র কঠিন ছিল ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। মেয়েটি আমার কাছে জানতে চেয়েছে, প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে জানার পরও যেহেতু পরীক্ষা বাতিল হয়নি, বাতিল হবে সেরকম কোনো আলোচনাও নেই, তার অর্থ সবাই পার হয়ে যাবে শুধু সে পার হবে না। সততার জন্য সে খুব বড় একটা মূল্য দেবে, ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ পাবে না, জীবনের স্বপ্নটি শুরু হবার আগেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আমি তাকে কী বলে সান্ত্বনা দেব ? তাকে বলব, বাংলাদেশে এটাই নিয়ম ? এই দেশে আমরা সত্ মানুষের জীবনটা ইচ্ছে করে ছারখার করে দেই ? আমি একে বলব যে, তোমার অসৎ হওয়া উচিত ছিল, তুমি নির্বোধের মত সৎ থেকেছ এখন তার জন্য মূল্য দাও ? কেউ একজন আমাকে কী বলবে, আমরা কী আনুষ্ঠানিকভাবে একটা জাতিকে অসৎ বানিয়ে দেয়ার প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি ? আমরা কী অন্যায়কে অন্যায়ও বলতে পারব না ?

সম্ভবত অন্য সবার মত আমারও হাল ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল। বলা উচিত ছিল যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয় কখনোই স্বীকার করেনি যে, প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, উল্টো সবাইকে উপদেশ দেয়া হয়েছে গুজবে কান না দিতে। যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। সেই হিসেবে আমি হয়তো রাষ্ট্রের চোখে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার দোষে দোষী একজন মানুষ। আমার হয়তো লম্বা লম্বা কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিজিটাল বাংলাদেশ জাতীয় বড় বড় কোনো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত ছিল। কিন্তু যতবার আমি এই দেশের ছেলে-মেয়েদের কথা ভাবি, যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিয়ে সত্যিকার ছাত্র বা ছাত্রীর মতো লেখাপড়া করে নিজের ভবিষ্যেক ধ্বংস করেছে ততবার আমার মনে হয় কিছুতেই এই বিষয়টাকে ভুলে যেতে দেয়া যাবে না। আমাকে চেষ্টা করতে হবে, যেন কর্তৃপক্ষ আগে হোক পরে হোক এই বিষয়টার দিকে নজর দেয়। এটি মোটেও এমন একটি বিষয় নয় যে, অল্প কিছু দুর্নীতিবাজ মানুষ তাদের অল্প কয়জন দুর্নীতিবাজ ছেলে-মেয়েদেরকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর তুলনায় তাদের সংখ্যা এতো কম যে, এই বিষয়টা উপেক্ষা করলেও সত্যিকার অর্থে দেশের এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

এটি মোটেও তা নয়, আজকাল বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ফেসবুক একাউন্ট আছে তারা এই ফেসবুক একাউন্ট ব্যবহার করে চোখের পলকে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র নামিয়ে আনছে। নামিয়ে আনার পর একে অন্যকে পৌঁছে দিয়েছে। যাদের কম্পিউটার ইন্টারনেট নেই তাদের ফ্যাক্স ফটোকপি আছে কাজেই লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ের হাতে এগুলো পৌঁছে গেছে।

এটি উপেক্ষা করা যায় সেরকম একটি সমস্যা নয়, এটি এই দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনছে সেরকম একটি সমস্যা।

আমি এই লেখাটি লিখছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। আমাদের দেশে যে কয়জন মন্ত্রী সাধারণ মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি তাদের একজন। জনপ্রিয় মন্ত্রীদের নিয়ে যখনই জরিপ করা হয় তিনি তখন সবার উপরে থাকেন। তার কারণও আছে, স্কুল-কলেজের লেখাপড়া নিয়ে তার আগ্রহ আছে। বছরের প্রথম দিন তার কারণে বাংলাদেশের সব ছেলে-মেয়ে হাতে নতুন বই পেয়ে যায়। শুধু বইয়ের সংখ্যা দেখলে পৃথিবীর যে কোনো মানুষের মাথা ঘুরে যাবে। বইগুলো একটার পর আরেকটা রাখা হলে সারা পৃথিবী দুইবার ঘুরে আসবে—বাচ্চাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আমি সুযোগ পেলেই তাদের এই কথাটা বলে অবাক করে দিয়েছি। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কলেজ উদ্বোধন করতে গিয়েছি। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আমি তার পাশে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রী পেতে দেখেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সাথে আমিও তার কথা শুনে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। কাজেই প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারটা তার নজরে আনা হলে তিনি কিছু একটা করবেন না, আমি সেটা বিশ্বাস করি না। তাই আমি অনেক আশা করে এই লেখাটি লিখছি। আমি আশা করছি, তিনি কষ্ট করে হলেও এই লেখাটুকু পড়বেন।

আমি তার কাছে বেশি কিছু চাই না, ছোট একটা বিষয় চাই। তিনি শুধু একটা সত্যি কথা বলবেন, জাতিকে জানাবেন এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। আমি চাই এই দেশের ছেলে-মেয়েরা অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে জানতে শিখুন, অপরাধকে অপরাধ হিসেবে স্বীকার করে নিতে শিখুন। তার বেশি কিছু নয়। একটা দেশের পুরো প্রজন্মকে যদি আমরা অনৈতিক হিসেবে গড়ে তুলি তাহলে সেই দেশকে নিয়ে আমরা কী কর ব?

যদি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাবার ঘটনাটি মেনে নেন তাহলে যারা প্রশ্ন ফাঁস করেছে তাদেরকে ধরার চেষ্টা করা যাবে। আমি এই দেশের একটা সত্যি কথা জানি, যদি কোনো অপরাধীকে ধরার ইচ্ছে থাকে তাহলে তাদের ধরা যায়। যেসব অপরাধীকে ধরা যায় না তাদেরকে আসলে ধরার চেষ্টা করা হয় না।

আমরা আশা করব, এই ঘটনার তদন্ত হবে, অপরাধীদের ধরা হবে, তাদের শাস্তি হবে। ভবিষ্যতে যেন আর কখনো এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেটি নিশ্চিত করা হবে। আমি জানি এটি করা সম্ভব।

এমনটি কী হতে পারে যে, এই লেখাটি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর চোখে পড়ল না ? কিংবা তার চাইতেও দুঃখজনক একটা ব্যাপার ঘটল, লেখাটি তার চোখে পড়ল, কিন্তু তার পরেও তিনি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাটা স্বীকার করলেন না —তাহলে আমরা কী করব ?

অন্যেরা কী করবে জানি না, কিন্তু আমি কী করব মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। তাহলে আমি শহীদ মিনার কিংবা এরকম কোনো একটা জায়গায় খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে থাকব। হাতে একটা প্ল্যাকার্ড রাখব সেখানে লিখব, "প্রশ্ন ফাঁস মানি না, মানব না। আমাদের ছেলে-মেয়েদের অসৎ হতে দেব না।"

তাতে কী কোনো লাভ হবে ? সম্ভবত হবে না। যখন এই দেশের ছেলে-মেয়েরা ক্ষুব্ধ চোখে আমাকে বলবে, "স্যার, আমরা এ কেমন দেশে বাস করি ? কেন এতো বড় অন্যায় আমাদের মেনে নিতে হবে?"

আমি তখন অন্তত তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলব, "তোমরা আমাকে ক্ষমা করো —আমি কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম।"

প্রশ্নপত্র ফাঁস কি অপরাধ নয়

আমি খুব আশাবাদী মানুষ। আমার পরিচিত মানুষেরা আমার এই লাগামছাড়া আশাবাদ দেখে খানিকটা কৌতুক অনুভব করেন, আমি তাতে কিছু মনে করি না। তার প্রথম কারণ, এই আশাবাদের কারণে আমি অন্যদের থেকে অনেক বেশি আনন্দে দিন কাটাই। দ্বিতীয় কারণ, আমার দীর্ঘজীবনে আমার বেশিরভাগ আশাবাদই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

এই দেশ নিয়েও আমি সবসময় খুব আশাবাদী। আমার নিজের চোখেই দেখছি, দেশটি আর দারিদ্রে মুখ থুবড়ে পড়া দেশ নয়। দেশটির অর্থনীতি আগের থেকে অনেক বেশি শক্ত। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী পাশের দেশের মানুষ থেকে আমাদের দেশের মানুষ অনেক দিক থেকেই বেশি শান্তিতে আছেন। এ রকম তথ্য আমি অমর্ত্য সেনের লেখা থেকে জেনেছি।

এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের অর্থনীতি চালিয়ে যাচ্ছে গার্মেন্টসের মেয়েরা, প্রবাসী শ্রমিকেরা এবং খেত-খামারের চাষীরা। আমাদের মতো শিক্ষিত মানুষেরা এখনও দেশের অর্থনীতিতে সে রকম কিছু দিতে পারেনি, কিন্তু আমি সেটা নিয়ে মোটেও নিরাশ নই। আমি সবসময় জোর গলায় বলি, আমাদের দেশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীই হচ্ছে প্রায় তিন কোটি (কানাডার লোকসংখ্যার সমান)। আর এই ছাত্রছাত্রীরা ঠিকভাবে লেখাপড়া শিখে যখন খেটে খাওয়া মানুষজনের পাশে দাঁড়াবে, তখন দেশের চেহারা পাল্টে যাবে।

আমি অনেক জোর দিয়ে এই কথাটি বলতাম। কিন্তু গত সপ্তাহের পর থেকে এই কথাটি বলার আগে আমার বুক থেকে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসছে। গত সপ্তাহে আমি নিশ্চিত হয়েছি, এই দেশে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়মিত ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশের সরকার নিয়মিতভাবে সেটা অস্বীকার করে যাচ্ছে।

পরীক্ষা লেখাপড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের মতো দেশে পরীক্ষাটা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ সব ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষায় ভালো করতে চায়। তাই পরীক্ষাটি যদি খুব ভালোভাবে নেওয়া যায়, অর্থাৎ পরীক্ষা পদ্ধতিটা যদি সঠিক হয়, তাহলে এই পরীক্ষায় ভালো করার চেষ্টা করতে গিয়েই ছেলেমেয়েরা সবকিছু শিখে ফেলে।

আমাদের যদি ভালো স্কুল না থাকে, ভালো শিক্ষক না থাকে, ভালো পাঠ্যবই না থাকে– কিন্তু খুব চমৎকার একটা পরীক্ষা পদ্ধতি থাকে, তাহলেও আমরা লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে যাব। দেশে যখন সৃজনশীল

পরীক্ষা পদ্ধতি এসেছে, আমরা তখন খুব খুশি হয়েছিলাম। মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, ছাত্রছাত্রীদের আর মুখস্ত করতে হবে না, এখন তারা চিন্তাভাবনা করে মাথা খাটিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে।

আমি একটিবারও ভাবিনি আমার দেশের সরকার, সরকারের শিক্ষাব্যবস্থা এই পরীক্ষার ব্যাপারে তাদের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে থাকবে। তারা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হতে দেবে আর সেটি নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ থাকবে না। এই সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে আমি অনেক কাজ করেছি। এখন আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে এই মন্ত্রণালয়টির দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না, যখন দেখি এই দেশের এত বড় বিপর্যয় নিয়ে তাদের কোনো রকম প্রতিক্রিয়া নেই!

শুধু যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিক্রিয়া নেই তা নয়, পত্রপত্রিকা বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোরও সে রকম প্রতিক্রিয়া নেই। আমি যে খবরের কাগজটি পড়ি সেখানে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবরটি ছাপ হয়নি, সম্পাদকীয় লেখা হয়নি, দেশের গুণীজন উপসম্পাদকীয় লিখেননি।

টেলিভিশন দেখার সুযোগ পাই না, তাই সেখানে কী হচ্ছে জানি না, কিন্তু ছোটখাট বিষয়ের জন্যেও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আমার মতামত নিতে চলে আসে। এবারে কেউ আসেনি, শুধুমাত্র একটি চ্যানেল আমার কাছে সেটি জানতে চেয়েছে। তাও সেটি ঘটেছে, কারণ আমি ফাঁস হওয়া প্রশ্ন এবং পরীক্ষার প্রশ্ন পাশাপাশি বসিয়ে খবরের কাগজগুলোতে একটা লেখা লিখেছিলাম।

এই কাজটুকুও আসলে আমার করার কথা নয়, এটি করার কথা সাংবাদিকদের। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়টি সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনো গুরুত্ব পায়নি। যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াতে পুরো জাতি অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে থাকে এবং এটি আসলে এখন প্রচার করার মতো কোনো খবর নয় বলে পত্রপত্রিকা বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে এর থেকে বড় বিপদে আমরা আগে কখনও পড়েছি বলে মনে হয় না।

নিজের চোখে ফাঁস হয়ে যাওয়া এইচএসসির প্রশ্নপত্র দেখার পর আমি খোঁজখবর নিয়েছি এবং আমি এখন নিশ্চিতভাবে জানি পিএসসি এবং জেএসসির প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছিল। এই ছোট ছোট শিশুগুলোর মা-বাবা কিংবা শিক্ষক তাদের হাতে প্রশ্নগুলো তুলে দিয়ে তাদের সেটা পড়িয়েছে। শিশুগুলো সেগুলো পড়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে আবিস্কার করেছে, হুবহু সেগুলোই পরীক্ষায় এসেছে।

তখন তাদের মনে বিস্ময়, আতঙ্ক কিংবা লোভ জন্মেছে কি না জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি এটি ছিল শিশুদের রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতি শেখানোর প্রথম পদক্ষেপ। একটি দুটি শিশু তাদের আশেপাশে

ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে অন্যায় করতে শিখে যেতে পারে, কিন্তু একটি রাষ্ট্র দেশের পুরো শিশুসমাজকে দুর্নীতি করতে শিখাতে পারে, এটি সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি।

আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘটনাগুলো স্বীকার করেনি, তাই এ রকম কাজ যে অন্যায় বাংলাদেশের কেউ এখনও সেটা জানে না। যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে, তারা এই দেশের আইনে এখনও অপরাধী নয়। অপরাধীর শাস্তি অনেক পরের ব্যাপার, কিন্তু প্রশ্ন ফাঁস করা যে অপরাধ এই সরকার এখনও সেই ঘোষণাটিও দেয়নি।

সরকার যদি প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে সেই বিষয়টি স্বীকারই না করে তাহলে এত বড় একটা অপরাধ করার জন্যে কাউকে শাস্তি কীভাবে দেবে ? যারা প্রশ্ন ফাঁস করার সঙ্গে জড়িত, যারা এই দেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া যাবে না– এর কারণটি কী আমি বুঝতে পারছি না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি মনে করে থাকে একটা অন্যায় এবং অপরাধের বিচার নিয়ে মুখ না খুললেই বিষয়টার কথা মানুষ ভুলে যাবে, তাহলে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, সেটি সত্যি নয়। এই দেশের প্রত্যেকটি মানুষ এই ঘটনার কথা জানে; বিশেষ করে যে সব তরুণ-তরুণী এই প্রশ্নফাঁসের কারণে হতাশায় ডুবে গেছে, তাদের অভিশাপ থেকে কিন্তু কেউ মুক্তি পাবে না।

২.

আমার কাছে প্রথমবার যখন একটি মেয়ে ফোন করে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাবার কথা জানিয়েছে তখন তার কাছে আমি ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নগুলো চেয়েছিলাম। পরীক্ষা হওয়ার পর সে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটিও পাঠিয়েছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া ছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্নটি দেখে আমি আহত হয়েছিলাম অন্য কারণে। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী যে পরীক্ষা দিচ্ছে সেই পরীক্ষার প্রশ্নটি এত অযত্নে কেমন করে তৈরি করা হল ? প্রশ্নে যে জঘন্য ছবিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এর চাইতে রুচিসম্মত সুন্দর ছবি আঁকার মতো কেউ কি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটিকে সাহায্য করার জন্যে নেই !

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে, একটা সমস্যার সমাধান করার জন্যে ধ্রুবগুলোর যে মানটুকু জানানো প্রয়োজন সেটি টাইপ করে লেখারও কেউ প্রয়োজন মনে করেনি! অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে প্রায় দুর্বোধ্য হাতের লেখায় প্রশ্নপত্রে লিখে দেওয়া হয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, টাইপ বা ছাপার পুরো

ব্যাপারে কারও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমি বিশ্বাস করতেই রাজি নই যে, এত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আরেকটু গুরুত্ব দিয়ে করা সম্ভব ছিল না।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যে চরম অবহেলা রয়েছে তার আরও অনেক প্রমাণ আছে। আমার কাছে অনেক ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করেছে, যারা ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের প্রশ্নে অনেক বড় বড় ভুল রয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের প্রশ্নে এমন ভুল আছে, যার কারণে উত্তরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে যেতে পারে।

অবহেলা ছাড়াও আরও সমস্যা আছে। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, জীববিজ্ঞান পরীক্ষার শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্ন গাইড বই থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তারা আমার কাছে গাইড বইটির নামও উল্লেখ করে দিয়েছে।

আমি সাংবাদিক নই। সাংবাদিক হলে তাদের অভিযোগটি যাচাই করে দেখতে পারতাম। এই মুহূর্তে আমার যাচাই করার সুযোগ নেই, কিন্তু এটি নিশ্চয়ই যাচাই করে দেখা সম্ভব। যদি দেখা যায়, সত্যিই প্রশ্নগুলো গাইড বই থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে কি যারা প্রশ্ন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না?

কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন, এই দেশের ইতিহাসে কতবার কত প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, কিন্তু কখনও কি কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? হাতে হাতকড়া লাগিয়ে কখনও কি কোনো মানুষকে হাজতে নেওয়া হয়েছে ?

ফেসবুক নামক একটি বিশেষ সামজিক নেটওয়ার্কিং-এর কারণে আজকাল ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন সবার মাঝে বিতরণ করা খুবই সহজ হয়ে গেছে। এই একটি দিকে বাংলাদেশ সত্যিকার ডিজিটাল যুগে পা দিয়েছে। মাঝে মাঝেই দেখতে পাই, কমবয়সী তরুণেরা ফেসবুকে বেফাঁস কোনো কথা বলে দেওয়ার কারণে পুলিশ কিংবা র‍্যাবের হাতে ধরা পড়ছে, জেল খাটছে। কিন্তু ফেসবুক ব্যবহার করে প্রকাশ্যে যখন ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নিয়ে বাণিজ্য করা হয়, তখন কেন কখনও তাদের কাউকে ধরা হয় না? তারা কীভাবে সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় ?

আমি কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে খুব স্পষ্ট করে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি ? সত্যি কি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে ? যদি ফাঁস হয়ে থাকে তাহলে সেটি কি অপরাধ ? যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে সেই অপরাধীদের ধরার জন্যে কি কোনো মামলা করা হয়েছে ? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। অনুগ্রহ করে আপনাদের কেউ কি আমার এই প্রশ্নটির উত্তর দেবেন ?

৩.

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি গত সপ্তাহে একটা ছোট লেখা লিখেছিলাম। তারপর অনেকেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে কীভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা যায় সে সম্পর্কে নানা পদ্ধতির কথা বলেছেন।

সত্যি কথা বলতে কী, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ব্যাপারটি সরকার স্বীকার করবে না, সেটাকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে অপরাধীদের ধরে শাস্তি দেবে না– ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো তথ্যপ্রযুক্তির কোনো পদ্ধতিই আসলে কাজ করবে না।

সরকার যদি এই ভয়ংকর ব্যাপারটি ঘটেছে সেটা ঘোষণা দিয়ে স্বীকার করে নিয়ে অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করে তাদের ভয়ংকর শাস্তি দিতে শুরু করে, তাহলে আর কিছুই করার প্রয়োজন হবে না। যে পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়, বিতরণ করা হয়, সেই পদ্ধতিতেই প্রশ্ন ফাঁস হতে না দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

সত্যি কথাটি হচ্ছে, প্রশ্ন আসলে ফাঁস হয় না, প্রশ্ন ফাঁস হতে দেওয়া হয়।

৪.

এই দেশের ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করে কয়দিন থেকে আমার মনটা খুব খারাপ। পিএসসি কিংবা জেএসসি পরীক্ষা দেওয়া শিশুদের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি দেওয়া হয়। যারা বৃত্তি পেয়েছে তারা আমাকে চিঠি লিখে বলেছে, যদিও তারা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন ছাড়াই পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু সবাই এখন তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে নানা রকম কটূক্তি করেছে।

যারা বৃত্তি পায়নি তাদের অনেকে আমাকে জানিয়েছে তাদের থেকে খারাপ পরীক্ষা দিয়ে অনেকে বৃত্তি পেয়ে গেছে; কারণ তাদের উপরের মহলে ধরাধরি করার লোক আছে। যেহেতু সাধারণের কাছে গোপন পরীক্ষায় পাওয়া আসল নম্বরের ভিত্তিতে এই বৃত্তি দেওয়া হয়, তাই এই পুরো পদ্ধতিটাই আসলে ভয়ংকর রকম অস্বচ্ছ !

এই শিশুদের অভিযোগ সত্য নয়, এই কথাটি পর্যন্ত কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে নম্বর তুলে দেওয়া হয়েছে– কিন্তু সেই নম্বর দিয়ে একটা ছাত্র বা ছাত্রীর ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করা হয় এবং কেউ কোনোদিন সেটা জানতে পারবে না। এত বড় একটা অস্বচ্ছ ব্যাপার কীভাবে সবাই দিনের পর দিন সহ্য করে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তারা একটু বড় হয়েছে। এখন তাদের সেই বয়স, যে বয়সে তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করার আগেই তাদের স্বপ্ন ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এবং সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার সেটি করছে তারাই যাদের স্বপ্ন দেখানোর কথা। যারা ফাঁস করা প্রশ্নপত্র পেয়ে সেটা পড়ে পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের ভেতরে এক ধরনের অপরাধবোধ কাজ করছে

(শুনেছি ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে লেখাপড়া করতে বসিয়ে মায়েরা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সেখান থেকে ছেলেমেয়েদের জন্যে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন বের করে এনেছেন)।

ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রে যারা পরীক্ষা দিয়েছে, তারা নিজেদের জন্যে নানা ধরনের যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিয়ে অপরাধবোধটি কমানোর চেষ্টা করছে এবং সেটি হচ্ছে দুর্নীতি শেখার প্রথম ধাপ। এই ছেলেমেয়েগুলো কিন্তু নিজে থেকে দুর্নীতি করতে চায়নি, তাদেরকে জোর করে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

যারা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন ব্যবহার না করে পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের ভেতর এখন একই সঙ্গে তীব্র হতাশা এবং ক্ষোভ। তাদের মুখে একটিই কথা, ‘‘ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন দিয়েই যদি সবাই পরীক্ষা দিয়ে ভালো নম্বর পাবে, তাহলে সারা বছর এত মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমার কী লাভ?’’

এইচএসসি পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপরীক্ষা শুরু হয়ে, তখন এই ছেলেমেয়েগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা তাদেরকে সত্য এবং ন্যায়ের কথা বলি, কিন্তু অসত্য আর অন্যায়কে লালন করি– এত বড় ভণ্ডামির উদাহরণ কি আর কেউ দিতে পারবে ?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বড় বড় হর্তাকর্তারা, সরকারের বড় বড় লোকজন খুব শান্তিতে থাকেন। ছোট ছোট শিশুরা, এই দেশের কিশোর-কিশোরীরা, তরুণ-তরুণীরা তাদের ধারেকাছে যেতে পারে না। তারা পুলিশের প্রহরায় গাড়ি করে যান, তাদের চিঠি পড়তে হয় না, ই-মেইল দেখতে হয় না। এই শিশু-কিশোর-তরুণেরা কিন্তু আমার মতো মানুষের কাছে আসতে পারে। যখন তীব্র ক্ষোভ নিয়ে আমার কাছে অভিযোগ করে তখন আমি তাদেরকে কী বলে সান্ত্বনা দিব বুঝতে পারি না।

তারপরও আমি তাদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি, আমি তাদেরকে বোঝাই শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবে, অন্যায়কে অন্যায় বলা হবে, অপরাধকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে-মুছে ফেলে নূতন করে সবকিছু শুরু করা হবে। আমাদের প্রজন্মের মানুষেরা যে কাজটি করতে পারেনি, নূতন প্রজন্ম নিশ্চয়ই সেই কাজটি করতে পারবে।

আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ, সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে এই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। দেশের সব মানুষের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, তাদের অবহেলা করে ঠেলে ফেলে দেবেন না।

তাদেরকে আত্মসম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বড় হতে দিন।

স্যার, কিছু একটা করুন

এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাসঁ হয়েছে আমি এখন সেটা নিশ্চিতভাবে জানি; আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। সারাদেশ থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার আগেই সেগুলো আমাকে পাঠিয়েছে। আমি তাদেরকে অনুরোধ করেছি সত্যি সত্যি যদি এগুলো পরীক্ষায় চলে আসে তাহলে তারা যেন আমাকে জানায়। পরীক্ষার পর তারা আমাকে জানিয়েছে, পরীক্ষার প্রশ্ন স্ক্যান করে আমাকে পাঠিয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের ফাসঁ হওয়া এবং সত্যিকারের প্রশ্নগুলো আমি সংবাদ মাধ্যমে ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। অন্যগুলো করিনি, রুচি হয়নি, প্রয়োজন মনে হয়নি, ফেসবুক এবং ইন্টারনেটে সারা পৃথিবীর মানুষ যেটা জানে আমাকে আলাদাভাবে কেন সেটা জানাতে হবে? তারপরও বলছি পরীক্ষার আগেই যে প্রশ্নগুলো আমার কাছে এসেছে আমার কাছে তার প্রমাণ আছে, কেউ চাইলে দেখতে পারে।

প্রশ্ন ফাসেঁর একটি বিষয় আমাকে খুব অবাক করেছে, কোনো একটি অজ্ঞাত কারনে সংবাদমাধ্যমে সেটি একেবারেই গুরুত্ব পায়নি। আমি ভেবেছিলাম এটি সংবাদপত্রে হেডলাইন হবে, হয়নি। ভেবেছিলাম দেশের বিবেক যে শিক্ষাবিদেরা আছেন তারা কিছু বলবেন, বলেননি। ভেবেছিলাম শিক্ষা বিষয়ের এনজিওগুলো সোচ্চার হবে, তারা মুখ খুলেনি। আমার মনে হচ্ছে আমি বুঝি একা চিৎকার করে যাচ্ছি শোনার কোন মানুষ নেই। আমি অনেক আশা করে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করেছিলাম, তার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি, প্রশ্ন ফাসঁ কে "সাজেশন" বলে উড়িয়ে দিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত যে বড় বড় কর্মকর্তারা প্রশ্নটা ফাঁস করলেন তাদের বিরুদ্ধে একটা কথা না বলে যারা এটা একে অন্যের কাছে বিতরণ করল শুধু তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করলেন!

সমস্যা হচ্ছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরোটা ভুলে যাবার কোন উপায় নেই। যে এগারো লক্ষ ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তারা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার ছেলে মেয়ে, তারা আমাদের স্বপ্নের ছেলে মেয়ে। তারা একটি প্রজন্ম, একটু একটু করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে তারা এতোদূর এসেছে, এখন আমরা তাদের ছুড়ে ফেলে দিতে পারবনা।

এদের ভেতর কিছু ছেলেমেয়ে আছে তারা প্রশ্ন পেয়েও সেটি দেখেনি। নিজের মত করে পরীক্ষা দেয়েছে, প্রশ্ন কঠিন ছিল বলে পরীক্ষা ভালো হয়নি। তারা ক্ষুব্ধ, কারন যারা ফাসঁ করা প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের পরীক্ষা অনেক ভালো হয়েছে, ভবিষ্যতের সকল সুযোগ এখন তাদের জন্যেই উন্মুক্ত হয়ে আছে। যারা নিজের কাছে সৎ থেকেছে তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত, যখন স্বপ্ন শুরু হয় তখনই তাদের স্বপ্ন ধূলিস্মাত হয়ে যাচ্ছে।

যারা প্রশ্ন ফাঁস করা প্রশ্ন পড়ে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের ভেতর এখন তীব্র অপরাধবোধ। তারা এই অনৈতিক কাজটি মোটেও করতে চায়নি, প্রশ্ন ফাঁস না হলে তারা সেটি করতোনা। প্রলোভন দেখিয়ে তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, অনেক সময় শিক্ষক এমন কী বাবা মা তাদেরকে এখানে ঠেলে দিয়েছে। এই অপরাধ বোধ একেকজনের ভেতরে একেক ভাবে কাজ করছে কিন্তু একটি বিষয় সত্যি, কারো ভেতরে কোনো আনন্দ নেই।

যার অর্থ এই দেশের এগারো লক্ষ পরীক্ষার্থীর কারো ভেতরে কোনো আনন্দ নেই। পুরো একটি প্রজন্মকে এতো পরিপুর্নভাবে ক্ষুব্ধ আর হতাশাগ্রস্থ কী এর আগে কেউ কখনো করতে পেরেছে ? রাষ্ট্রীয়ভাবে এর আগে কী কেউ কখনো একটা তরুণ প্রজন্মকে অন্যায়কে দেখেও না দেখার ভান করে, দুর্নীতির পাঠ দিয়েছে ? মনে হয় না।

এই ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন ফাঁস করেনি। কোনো রিকশাওয়ালা প্রশ্ন ফাঁস করেনি, গার্মেন্টসের কোন মেয়ে প্রশ্ন ফাঁস করেনি, কোনো শ্রমিক, কোনো চাষী, কোনো দিন মজুর প্রশ্ন ফাঁস করেনি। প্রশ্ন ফাঁস করেছে শিক্ষামন্ত্রনালয় কিংবা শিক্ষাব্যবস্থার খুব উপরের দিকের মানুষ, যারা প্রশ্ন প্রনয়ন করেন, যারা প্রশ্ন ছাপান, যারা সেগুলো বিতরন করেন তারা। এই দেশের এতো বড় সর্বনাশ করেছে কারা, আমরা কী সেটা কখনোই জানতে পারব না? “প্রশ্ন ফাঁস হয়নি” বলে এই দেশের সবচেয়ে বড় অপরাধীদের কেন রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে ?

এই দেশের শিক্ষার্থীরা আমাকে শুধু একটা কথাই বলছে, “স্যার, কিছু একটা করেন !” আমি কী করব ? যা করতে পারি, একটুখানি লেখালেখি – সেটা তো যথেষ্ট করেছি কোনো লাভ হয়নি। এর আগের লেখায় কথা দিয়েছিলাম যদি কিছুই করতে না পারি তাহলে অন্তত প্রতিবাদ হিসেবে একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে শহীদ মিনারে বসে থাকব, তাই ঠিক করেছি এই শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে থাকব। (খুব আশা করছি তখন যেন আকাশ কালো হয়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খুব ভালো লাগে।) অপরাহ্নে আমাকে একটা সংগঠন পুরষ্কার দেবে, তানা হলে সারাদিন বসে থাকতাম।

কেন আমি এটা করতে যাচ্ছি ? না আমি মোটেও আশা করছি না কিছু একটা হবে, যদি হওয়ার থাকতো এতোদিন হয়ে যেত। তবুও আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত এই প্রতিবাদটি করব আমার দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে। তাদেরকে বলব, তোমরা আশা হারিও না, স্বপ্ন হারিও না। আমরা এই দেশের স্বপ্ন দেখি তোমাদের সুখের দিকে তাকিয়ে। তোমরা যদি স্বপ্ন না দেখ, আমরা তাহলে কী নিয়ে স্বপ্ন দেখব? আমি তাদেরকে বলব, তোমরা নিজেকে অপরাধী ভেবো না, তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ো না। তোমরা হতভাগা নও, হতভাগা আমরা, যারা তোমাদেরকে এখনও স্বপ্ন দেখার সুযোগও করে দিতে পারি না। ফরিদপুরের সেই পরীক্ষার্থী তরুণটি, যে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নিয়ে পাগলের মতো এক জায়গা থেকে

অন্য জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছে, যাকেসবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমি তার কাছে এই দেশের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাই। আমি তাকে বলতে চাই, আমি তোমার ক্ষোভটুকু অনুভব করতে পারি, একদিন এই দেশে নিশ্চয়ই তোমার মতো তরুণদের এই তীব্র ক্ষোভ নিয়ে পাগলের মতো পথে পথে ছুটতে হবেনা। আমরা পারিনি, তোমরা ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সেই দেশ উপহার দিতে পারবে।

সরকারের উদ্দেশ্যে কি কিছু বলব ? জানি কোনো লাভ নেই তবুও বলছি। এটি কোনো দাবি নয়, এটি বিনীত একটি অনুরোধ। প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, সেটি স্বীকার করুন। সমস্যাটা আছে সেটা মেনে নিলেই শুধু সেই সমস্যার সমাধান করা যায়, সমস্যাটা অস্বীকার করলে সেই সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে? প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে মেনে নেবার পর এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কী করতে হবে সেটা বের করার জন্যে একটি পাবলিক হিয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করুন। দেশের মানুষের কাছে, ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদদের কাছে জানতে চান কী করা যেতে পারে। আমি নিশ্চিত, তারা সঠিক বাস্তব একটা সমাধান বের করে দেবে।

আমরা জেনে গেছি মন্ত্রণালয় বা শিক্ষাব্যবস্থার মাঝে অনেক মানুষ আছে যাদের এই দেশের জন্যে কোনো মায়া নেই। কিন্তু এই দেশের সাধারণ মানুষের বুকের ভেতর দেশের জন্যে গভীর ভালোবাসা রয়েছে, তারা এই দেশটিকে ধ্বংস হতে দেবে না।

ভাঙ্গা রেকর্ড

১.

পরীক্ষার প্রশ্নপ্রত্র ফাঁসের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের নজরে আনার জন্য আমি অনেকদিন থেকে চেষ্টা করে আসছিলাম, খুব একটা লাভ হয় নি । তাই শেষ পর্যন্ত আমাকে গত শুক্রবার একটি নাটকীয় কাজ করতে হল, আগের দিন পত্রিকায় একটা লেখা পাঠিয়ে, আমি সেখানে লিখলাম বিষয়টার প্রতিবাদ হিসাবে পরের দিন শুক্রবার আমি শহীদ মিনারে একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে থাকব। তখন অনেকেই আমার কাছে জানতে চাইল কখন কিভাবে আমি সেখানে যাব। সাংবাদিকেরা, টেলিভিশন চ্যানেল গুলো আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল কিন্তু আমি কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। পুরো বিষয়টি ছিল একান্তভাবেই আমার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ, সেখানে আমি নিজে থেকে কাউকেই ডাকতে পারি না। কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারি না। নিজের উদ্যোগে কেউ চলে আসলে সেটি ভিন্ন কথা।

শুক্রবার অনেকেই শহীদ মিনারে চলে এল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আছে, স্কুলের শিশুরা আছে, এইচ এস সি পরীক্ষার্থীরা আছে, বেশ কিছু শিক্ষক আছেন, এক দুইজন গৃহিণীও আছেন। কিছুক্ষনের ভেতর সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের সাংবাদিকেরাও চলে আসতে শুরু করলেন। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খুব ভাল লাগে আর সত্যি সত্যি ঝুম বৃষ্টি শুরু হল, অন্যদের বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগে আমি জানি না, কিন্তু শহীদ মিনারে প্রায় সবাই সেই বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে গেল।

(আমি অনেককে বৃষ্টিতে ভেজার কথা শুনলে আতকে উঠতে দেখিছি। কিন্তু সবাইকে বলে রাখি আমাদের দেশের বৃষ্টির মত সুন্দর আর কিছু নেই। বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হয় আমার জীবনে সেটি কখনো ঘটেনি।)

শহীদ মিনারে একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে আমার বসে থাকার কথা ছিল, আমি তাই খুব যত্ন করে একটা প্ল্যাকার্ড তৈরি করে সেখানে লিখে নিয়ে গেলাম "প্রশ্ন ফাঁস মানিনা মানবনা ছেলে মেয়েদের স্বপ্ন ধ্বংস হতে দিব না।" আজকাল ক্যামেরার কোন অভাব নেই তাই সেখানে প্রচুর ছবি তোলা হল এবং আমি প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে আছি সেই ছবিটা নিশ্চয়ই ফেসবুককে ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্ত আমি আসলে এই বিষয়টার কথা বলতে যাচ্ছি না, অন্য একটা কথা বলতে চাচ্ছি।

প্লে-কার্ড হাঁতে আমার শহীদ মিনারে বসে থাকার ছবিটি নিয়ে একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। কোন একজন ছবির প্ল্যাকার্ড এ আমার লেখার মাঝে খানিকটা পরিবর্তন করে সেই ছবিটা ফেসবুক এ ছেড়ে দিল। এখন

এই ছবিটা দেখলে যে কেউ ভাববে আমি যে শুধু মাত্র প্রতিবাদ করছি তা নয় প্রশ্ন ফাঁস হওয়া পরীক্ষা গুলো বাতিলও করার দাবি জানাচ্ছি।

প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার এই মহা বিপর্যয়ের জন্য ঠিক কি করতে হবে আমি কিন্তু সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ঠ একটি দুটি কথা বলেছি। কাউকে সব পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নেয়ার পরামর্শ দেইনি। কিন্তু আমি সেটাই দাবী করছি কিছু মানুষ এই সংবাদটা প্রচার করার জন্য খুব ব্যস্ত। কারনটা কি সেটি এখনো আমার কাছে রহস্য। আমার জীবনে এটি নতুন কোন রহস্য নয়, একসময় স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মান্ধরা আমার বিরুদ্ধে লেগে থাকত, এখন অন্যরাও তাদের সাথে যোগ দিচ্ছে।

যাই হোক শহীদ মিনারে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে থাকার কারনে একটা খুব বড় কাজ হল, হটাৎ করে সারা দেশের সব মানুষ জানতে পারল দেশে খুব বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। যারা দীর্ঘ দিন থেকে মেনে নিয়েছিল যে, "পরীক্ষা মানেই হল প্রশ্ন ফাঁস" তারাও এবার নড়ে চড়ে বসলো। যে সব সংবাদপত্র এতদিন ভুলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে একটি লাইন ও লিখেনি তারা সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করল, যে টেলিভিশন চ্যানেল প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কিছু প্রচার করেনি তারা আমাকে কিংবা আমার মত শিক্ষকদের টক শোতে ডাকতে শুরু করলো, এমনকী শিক্ষাবিদেরাও প্রশ্ন পত্র ফাঁস নিয়ে কলাম লিখতে শুরু করলেন। একটা সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হলেই শুধু মাত্র সেই সমস্যার সমাধান করা যায় - মনে হল শিক্ষা মন্ত্রনালয় সেটি পুরোপুরি স্বীকার করে না নিলেও দেশের মানুষ সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। কাজেই বিষয়টাকে আর সম্ভবতঃ ধামা চাপা দিয়ে রাখা যাবে না।

তবে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ে আমার এখন কিছু বক্তব্য রয়েছে- তাদের দায়িত্বটি আমি এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারছি না। এবারে যে ব্যাপক ভাবে প্রশ্ন পত্র ফাঁস হয়েছে সেটি নিয়ে আমার কিংবা পরীক্ষার্থীদের মাঝে তিল পরিমান সন্দেহ নেই। পরীক্ষার আগে যে প্রশ্নটি এসেছে দুদিন পর সেই প্রশ্নটিই পরীক্ষায় আসছে এখানে সন্দেহ করার জায়গাটি কোথায় ? কিন্তু সংবাদ মাধ্যম গুলো কেন জানি পুরো বিষয়টি এখনো নিশ্চিত সত্য বলে স্বীকার না করে এটি অভিযোগ বলে গা বাঁচিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে যাচ্ছে। এটি শুধুমাত্র একটা অভিযোগ নাকি সত্যি সত্যি এটা ঘটেছে সেটি প্রমাণ করার দায়িত্ব কার? আমার নাকি সংবাদ মাধ্যমের ? আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পরও সংবাদ মাধ্যম কেন সেটি বিশ্বাস করে এটাকে একটি সত্য ঘটনা হিসেবে প্রচার করে না ? কেন তারা এটাকে শুধুমাত্র একটা অভিযোগ হিসেবে বিবেচনা করে ?

যাই হোক, প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে এই চেঁচামেচিতে কিছু কাজ হয়েছে। বুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবাদ হিসেবে শহীদ মিনারে নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছে। খবরের কাগজে দেখতে পেলাম আগামী **১১** জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব শিক্ষাবিদদের ডাকা হয়েছে। সরাসরি এখনো বলা হয়নি যে তাদেরকে প্রশ্ন ফাঁস নিয়েই আলোচনা করার জন্যে ডাকা হয়েছে কিন্তু আমি আশা করছি এই সময়ে দেশের বড় শিক্ষাবিদদের ডাকা হলে তাঁরা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা তুলে আনবেন। আমি এখন খুব আগ্রহ নিয়ে এই এগারো তারিখের মিটিংয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছি।

২.

শুক্রবার ভোরবেলা আমি শহীদ মিনারে বসে ছিলাম, বিকেল বেলা এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা হল। প্রশ্ন ফাঁসের মত এত বড় বিপর্যয়ের জন্য কেউ না কেউ নিশ্চয় দায়ী, যেহেতু কাউকে সেই দায় নেবার জন্য এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই দায়টুকু শিক্ষামন্ত্রীর ঘাড়েই এসে পড়বে। পুরস্কার বিতরণীর সেই অনুষ্ঠানেও তখন তাকে শিশু সাহিত্যের পাশাপাশি প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কিছু কথা বলতে হল। মঞ্চে অনেকে বসে ছিলাম তার মাঝে বেছে বেছে শুধু আমাদের দুজনের ছবি তুলে সেই ছবিটা সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। শুনেছি সেই ছবি নিয়ে ফেসবুক জগতে অনেক ধরনের সমালোচনা হয়েছে । আমি কখনই ফেসবুক এর আলোচনা সমালোচনা দেখি না, দেখার সুযোগ ও নেই তাই ঠিক কোন বিষয়টিকে সমালোচনা করা হয়েছে জানি না। কিন্তু কোন বিষয়ে কারো সাথে সাময়িক মত পার্থক্য থাকলে আমি তার পাশে কেন বসতে পারব না আমি সেটা বুঝতে পারিনি। বিশেষ করে যখন একটা পুরস্কার দেবার জন্য আমাকে সেখানে ডেকে নিয়ে আয়োজকরা আমাকে সেখানে বসিয়েছেন। আমার সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর খুব ভালো সম্পর্ক তাই সেদিন ও নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে তৈরী করে দেওয়া তদন্ত কমিটির সাথে ফোনে কথা বলে তখন তখনই আমার সাথে কথা বলার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমি সিলেট থাকি, শুক্র শনিবার কিংবা ছুটি ছাটায় ঢাকা যেতে পারি। তাই তদন্ত কমিটিকে পরেরদিন শনিবারেই তাড়াহুড়ো করে আমার সাথে দেখা করতে হলো। ঢাকা শহরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোথাও হাজির হওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুতে নেই, তাই ছুটির দিনে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সদস্যদের এক জায়গায় উপস্থিত হতে তাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তদন্ত কমিটির সদস্যরা দীর্ঘ সময় বসে আমার কথা শুনলেন, আমার রাগ দুঃখ ক্ষোভ হতাশা সবকিছুই খুব সমবেদনার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আমি আমার কথাগুলো শুধু পত্রপত্রিকার কলাম লিখে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলাম, এই তদন্ত কমিটির সদস্যদের দিয়ে সেটি সঠিক জায়গায় পৌছাতে পারলে নিজেকে অনেকটা হলেও সান্তনা দিতে পারব।

৩.

আমি এক সময়ে অনিয়মিত ভাবে পত্রপত্রিকায় লিখতাম। আজকাল নিয়মিতভাবে লিখি। নিয়মের বাইরেও যদি কিছু একটা লিখি পত্রপত্রিকাগুলো সাধারণত সেগুলো ছাপাতে আপত্তি করে না। মজার ব্যাপার হল আমি যা লিখি বা যেভাবে লিখি এই দেশের অসংখ্য মানুষ তার চাইতে অনেক সুন্দর করে অনেক গুছিয়ে লিখতে পারে। আমি বিশেষভাবে চমৎকৃত হই যখন দেখি কমবয়সী তরুণ-তরুণী কিংবা কিশোর-কিশোরীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে কিছু একটা লেখে। প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে অনেকেই আমার কাছে অনেক কিছু লিখেছে সবই ব্যক্তিগত চিঠির মত, আমি সেগুলো থেকে তাদের মনের কিছু কথা পাঠকদের জন্যে তুলে দিচ্ছি।

ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন পেয়ে একজন লিখেছে, "... আমার প্রথম পত্র পরীক্ষা ভয়ঙ্কর খারাপ হয়েছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্ন এসেছে দেখে লিখতে ইচ্ছে হয়নি। ঘেন্না লেগেছে। এখনো পড়ছি না, রুচি হচ্ছে না। কি হবে পড়ে বলবেন? আমার আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এই সিস্টেম আমার জীবনকে তছনছ করতে পারবে না। আমি এত সস্তা না। আর পারলে করুক!"

এ রকম একটা চিঠি পেলে কেমন লাগে সেটা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। তারপরও আমি ছেলেমেয়েগুলোর মনের জোর দেখে চমৎকৃত হই। আরেকজন লিখেছেন, ".... আমার ছোট ভাই চাকরির পাশাপাশি প্রাইভেট পড়ায়। তার একটা ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমি ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলাম। গত ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার সময় হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষার পূর্বের রাতে সে দেখে তার এক ছাত্র বাজারে ঘুরছে। সে তাকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করে দিলে সে বলে যে তার পড়তে হবে না কারণ প্রশ্ন তার হাতে এবং প্রস্তুতি শেষ। আমার ভাই তাকে বলে, সে প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্যতা কি? ছাত্রের উত্তর ছিল, "স্যার গণিত পাইছিলাম হুবহু কমন, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র ১০০%, অতএব হিসাববিজ্ঞান নিয়া চিন্তা নাই, অবশ্যই কমন পড়বই।" পরের দিন দেখা গেল ঐ ছাত্রের কথাই সত্যি এবং সে হিসাব বিজ্ঞানে এ প্লাস এবং মোট জিপিএ ৪.৮৮ পেয়েছে। অথচ এই ছাত্র পাস করবে কি না তা নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিল। এই হলো বাস্তবতা।"

এই চিঠির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কী সবাই লক্ষ্য করেছে ? আমরা শেষ পর্যন্ত এই বছরের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে হইচই করছি। এই চিঠিতে কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে- শুধু তাই নয় গত বছরের এসএসসি যার অর্থ প্রশ্ন ফাঁস আসলে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া একটা বিপর্যয় নয়, এটা একটা নিয়মিত ঘটনা। আমি যতদূর জানি শুধু এসএসসি নয়, পিএসসি এবং জেএসসিতেও এটা ঘটছে। যখন ভয়ঙ্কর অন্যায়কে নিয়মিত গ্রহণযোগ্য ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া হয় তার চাইতে সর্বনাশা কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই।

এবারে একজন মায়ের লেখা একটা চিঠি: "...নিরুপায় হয়ে আপনাকে লিখছি। আমার মেয়ে একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থী। প্রথম পরীক্ষার পরের দিন থেকেই জানতে পারি প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। শুধু

অভিভাবক হিসেবে নয়, নীতিগত কারণে এবং বিশ্বাস থেকেও বললাম বিভ্রান্ত হয়ো না, মিসগাইড করার জন্যও কেউ কেউ বিভ্রান্তি ছড়ায়। তখনও জানি না আমার জন্য কী বিস্ময় অপেক্ষা করছে। ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার পরীক্ষা দিয়ে এসে বলল, আম্মু আমার আশেপাশে ম্যাক্সিমাম মেয়ে প্রশ্ন পেয়েছে।" জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে? বলল ফেসবুকে। ... এরপর ওকে বললাম সেখানে ঢুকলেই যদি প্রশ্ন পাওয়া যায় তুমি নাও। দেখলাম মেয়ের চোখে পানি। আমাকে বলল, আমি তো পড়েছি, আমি কোন প্রশ্ন দেখব না। বললাম, তুমি যদিও মনে করছ এটা অপরাধ আমি মনে করছি এটা অপরাধ নয়।... আমি বা তুমি কারও শরণাপন্ন হচ্ছি না বা টাকা খরচ করছি না। ফেসবুকের মতো গণমাধ্যমে এটা প্রচার করা হচ্ছে। এটা সবার দেখার জন্য। সবাই প্রশ্ন দেখে পরীক্ষা দেবে, তোমার থেকেও ভালো রেজাল্ট করবে তখন কষ্ট হবে। তাছাড়া ভর্তির ক্ষেত্রে তো তুমি পিছিয়ে যাবে। মেয়ে রাজি হলো না। আমি ওর মনের ওপর চাপ দিলাম না। ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার আশপাশে সবার পরীক্ষা ওর থেকে ভালো হলো ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দিয়ে। এরপর ১৭ দিন গ্যাপ তারপর কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। পরীক্ষার আগের রাতে নেটে গেলাম রাত একটায় দেখলাম প্রশ্ন চলে এসেছে। ল্যাপটপ নিয়ে মেয়ের পাশে যেয়ে বললাম একটা লুক দাও। মেয়ে কড়া সুরে ২ বার বলল 'না' - চলে আসলাম। আর কিছু ওকে বলিনি। ম্যাথ ফার্স্ট পেপার পরীক্ষায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রশ্ন ফাঁস। সবার পরীক্ষা এক্সিলেন্ট ওর পরীক্ষাও ভাল তবে যেহেতু হলে বসে চিন্তা করে করেছে সময়ে কুলাতে পারেনি। ৪ নম্বর ছেড়ে আসতে হয়েছে। চেহারায় কষ্টের ছাপ। সাথে ২/১ জন বান্ধবী ছিল যারা প্রশ্ন দেখত না। তারাও সেদিন দেখেছে। ভয় পেলাম কি জানি নার্ভাস ব্রেক ডাউন না হয়ে যায় ...। আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আমার মেয়ে কি সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া ছেলেমেয়েদের দলে পড়ে গেল না? ও কি সেই বদনাম থেকে কলঙ্ক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে যাদের দিকে মানুষ আংগুল তুলে দেখাবে ওরা ২০১৪ সালের ফাঁস হওয়া প্রশ্ন নিয়ে এইচএসসি পাস করেছে। ..."

এই চিঠিটা থেকে বোঝা যায় কিভাবে অভিভাবকেরা না চাইলেও শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের কাছে অসহায়ভাবে মাথা নত করতে বাধ্য হয়ে যান। তবে যে বিষয়টি এখনো আমাকে আশা নিয়ে বাঁচতে শেখায়, সেটি হচ্ছে শত প্রলোভনেও কমবয়সী একটা মেয়ে মাথা উচু করে সৎ থেকে যায়।

আমার কাছে এ রকম অসংখ্য চিঠি আছে, আমি পড়ি এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

৪.

প্রশ্ন ফাঁসের এই ব্যাপারটি এতো জটিল এবং এতো পরিপূর্ণ একটি বিপর্যয় যে এখান থেকে কিভাবে বের হয়ে আসা যাবে আমি সেটা ভেবে ভেবে কোন কূল কিনারা পাই না। তবে আমি মনে করি অবশ্য অবশ্যই

এই মুহূর্তে সরকারের সবচেয়ে উচ্চ পর্যায় থেকে তিনটি কাজ করা উচিত। সেই কাজ তিনটি হচ্ছে:

ক) এই দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে খুব মন খারাপ করে বসে আছে, তাদের মনটি ভালো করে দেয়ার জন্যে কিছু বলতে হবে। তাদেরকে কী বলা হবে সেটি ভাবনা চিন্তা করে ঠিক করা যেতে পারে, কিন্তু কিছু একটা বলতেই হবে। বিশেষ করে যারা প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাবার পর সুযোগ পেয়েও সেই প্রশ্ন দেখেনি তাদেরকে একটা স্যালুট দিয়ে বলতে হবে, তোমরাই এই দেশের ভবিষ্যত।

খ) সামনেই বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা। যারা এবারে এইচএসসি দিয়েছে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে যে ভর্তি পরীক্ষায় এইচএসসি এর ফলাফল যেন কোন বড় ভূমিকা রাখতে না পারে সেটি নিশ্চিত করা হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্মিলিতভাবে এই কাজটি করতে হবে।

গ) তৃতীয় বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী, এই দেশের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারকে ঘোষণা দিতে হবে অতীতে যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এই বাংলাদেশে আর কোনদিন কোন প্রশ্ন ফাঁস হবে না। প্রশ্ন যেন ফাঁস না হতে পারে সেজন্যে তথ্যপ্রযুক্তি থেকে শুরু করে দেশের সকল উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে সবাই মিলে ব্যবহার করবে, কিন্তু প্রশ্ন আর কখনও ফাঁস হবে না।

আমাদের প্রিয় দেশটির ভবিষ্যত যে কত সুন্দর সেটি সবাই অনুমান করতে পারে কী না আমি জানি না। অল্প কিছু দায়িত্বহীন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে থাকা মানুষের জন্যে আমরা আমাদের সেই সুন্দর ভবিষ্যতটি কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। যদি কেউ চেষ্টা করে কাজ হোক আর না হোক ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো আমি চিৎকার করতেই থাকব!

কিছু একটা করি

১।

দশ বারো বছর আগের কথা। তখন জামাত-বিএনপি-হাওয়া ভবনের রমরমা রাজত্ব। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন মানুষজনকে ভিসি-প্রোভিসি হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যাদের বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা লেখাপড়া নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। নিজের দলের মানুষজনকে নিয়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরণের তান্ডব চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের একমাত্র কাজ। "দুঃসময়ে টিকে থাকাটাই হচ্ছে বিজয়" এরকম একটা কথা আছে তাই আমরা দাঁতে দাঁত কামড়ে কোনোমতে টিকে আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম দূরে থাকুক, একটা সূতো পর্যন্ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে পারি না। তখন হঠাৎ একদিন আমি একটা বিষয় আবিষ্কার করলাম, আমি দেখলাম যখনই আমরা কয়েকজন শিক্ষক একত্র হই তখনই চারপাশে কী কী খারাপ খারাপ ব্যাপার ঘটছে সেটা নিয়ে কথা বলি, তারপর সবাই লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলি! সবার ভেতরেই এক ধরণের ক্ষোভ, মন খারাপ করা হতাশা, আমরা একে অন্যের সাথে সেটা দেয়া নেয়া করছি। তাতে ক্ষোভ, হতাশা আর মন খারাপটুকু আরো কয়েক গুণ বেড়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমাদের সবার ভেতরেই বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান নির্ভর এক ধরণের মানসিকতা আছে, কাজেই আমরা যখন একত্র হব তখন আমাদের এরকম বুদ্ধি ভিত্তিক মুক্ত চিন্তার বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিৎ। আমি তখন আমাদের শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা একত্র হয়ে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। এটার নাম দেয়া হল "টুইসডে আড্ডা" এবং নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে এটা এখনো টিকে আছে। এখনো মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা আমরা একত্র হই, কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলি। কথাবার্তা গুলো যদি লিখে রাখা হতো তাহলে সেগুলো অত্যন্ত চমকপ্রদ একটা সুখপাঠ্য বিষয় হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অনেকদিন পর আমার এই "টুইসডে আড্ডা"র জন্ম কাহিনী মনে পড়ে গেল তার কারণ হঠাৎ করে আমি লক্ষ্য করলাম আমি আবার একই বিষয় করে যাচ্ছি। পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আমার ভেতরে ক্ষোভ এবং হতাশা, আমি দিনের পর দিন সেই ক্ষোভ আর হতাশার কথা লিখে যাচ্ছি। (একটু খানি হলেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেছে, ভবিষ্যতে যদি আর কখনো প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় আমার ধারণা আমরা অনেক খানি অর্জন করেছি বলে দাবী করতে পারব।) কিন্তু আমি আর ক্ষোভ এবং হতাশার কথা লিখতে চাই না, স্বপ্নের কথা লিখতে চাই।

গত ১১ তারিখ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দফতরে এই দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটা সভা হয়েছে, এই সভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে যদিও "প্রশ্নপত্র ফাঁস" কথাটি ব্যবহার করা হয়নি কিন্তু সবাই জানতো নিশ্চিতভাবেই এটা নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সবার সামনে অঙ্গীকার করেছেন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাবার পর ভবিষ্যতে যেন প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয় সে ব্যাপারে যেটুকু করা সম্ভব হয় সেটা করবেন। আমরা তাই আপাতত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছি।

১১ তারিখের সভায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন, তাদের অনেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিছু কিছু বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমি তার কয়েকটা এখানে সবার জন্যে তুলে ধরছিঃ

ক) আমাদের দেশে আর নূতন কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের দরকার নেই। ষোল কোটি মানুষের কোনো একটি দেশে হয়তো আরো বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিকেল কলেজ থাকা সম্ভব কিন্তু আমাদের দেশের জন্যে সেটি সত্যি নয় - তার কারণ এই দেশে এই মুহুর্তে নূতন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ানোর জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। ইতোমধ্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে, জেনে শুনে সেটার আরো সর্বনাশ করার কোনো অর্থ নেই।

খ) আজকাল পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাশের হার একেবারে আকাশ ছোঁয়া, বিষয়টা নিয়ে আমরা সবাই আনন্দ করতে পারতাম - এমনকি গর্ব করতে পারতাম। কিন্তু আসলে আমরা সেটা নিয়ে আনন্দ কিংবা গর্ব করি না, মুখ বুঁজে হজম করি। তার কারণ যারা পরীক্ষার খাতা দেখেন তাদেরকে অলিখিত কিন্তু কঠিনভাবে মৌখিক নির্দেশ দেয়া হয় সবাইকে শুধু উদারভাবে নয়, দুই হাতে মার্কস দিতে হবে। বিষয়টি এই দেশের সবাই জানে কিন্তু আমরা খুবই অবাক হলাম যখন টের পেলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেটি জানে না! যদি সত্যি তারা না জানেন তাহলে বিষয়টা আরো ভয়ঙ্কর, তার অর্থ এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নির্দেশের তোয়াক্কা না করে নিজেদের মত করে পরীক্ষা পাশের মচ্ছব বসিয়ে দিচ্ছে। বিষয়টা নানা কারনে হৃদয় বিদারক, যার সব বিষয়ে জিপিএ ফাইভ পাবার কথা না তাকেও যদি রীতিমত জোর করে জিপিএ ফাইভ দিয়ে দেওয়া হয় তখন তার নিজের সম্পর্কে একটা ভুল ধারনা হয়ে যায়। যখন এই অতিরঞ্জিত গ্রেড নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ পাওয়া দূরে থাকুক পাশ পর্যন্ত করতে পারেনা তখন তারা খুব খারাপ ভাবে একটা ধাক্কা খায়। তাদের আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মান একেবারে ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের এভাবে মানসিক নির্যাতনে ঠেলে দেয়ার কোন মানে হয় না।

গ) আমরা হঠাৎ করে আবিষ্কার করছি মাদ্রাসার পাঠ্যবইগুলোতে এক ধরনের সাম্প্রদায়ীকরন করা হচ্ছে। বইয়ের বিষয় বস্তু, বইয়ের ছবিতে এক ধরনের কৃত্রিম বিভাজন নিয়ে আসা হচ্ছে। সাধারন ছেলেমেয়ের ছবি নেই, সব টুপি পরা ছেলে হিজাব পরা মেয়ে। এ ধরণের সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে মন্ত্রণালয় জানে না এবং এনসিটিবি নিজেদের উদ্যোগে সেগুলো করে ফেলছে - এটি হচ্ছে সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার। আমরা আমাদের শিক্ষানীতিতে খুব উচ্চ কণ্ঠে বলব এই দেশটা সকলের জন্যে, কিন্তু পাঠ্যবইগুলো ছাপাব দেশ সম্পর্কে খুব ভিন্ন একটা ধারনা দেবার জন্যে সেটা তো হতে পারে না।

ঘ) স্কুল পরিচালনা কমিটি গুলোতে যোগ্য লোকের খুব অভাব। সরকারী দলের অনুসারী কিংবা ক্ষমতাশালী লোকজন এই কমিটির সভাপতি হিসেবে থেকে স্কুলের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। নিয়োগ নিয়ে ভয়ঙ্কর এক ধরনের বাণিজ্য হচ্ছে এবং শিক্ষক হিসেবে যোগ্য নয় এরকম মানুষজন দূর্নীতি করে শিক্ষক হয়ে যাচ্ছে। একটা স্কুলে যদি ভালো শিক্ষক না থাকে তাহলে সেই স্কুলের আর থাকল টা কী ?

ঙ) পৃথিবীর সব দেশে একটা স্কুল যে এলাকায় থাকে সেই এলাকার ছেলেমেয়েরা সেই স্কুলটিতে পড়ার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে সেটি ঘটেনি, এখানে যে স্কুলগুলোর ভালো স্কুল হিসেবে সুনাম আছে সবাই সেখানে পড়ার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেই স্কুলে পড়ানোর জন্যে বাবা মায়েরা হন্যে হয়ে পড়েন, এমন কোনো কাজ নেই যেটা করেন না। অথচ প্রত্যেকটা স্কুল যদি একটা নির্দিষ্ট এলাকার ছেলেমেয়ের জন্যে নির্দিষ্ট করা থাকতো তখন অন্য কোনো উপায় না দেখে সবাই তার এলাকার স্কুলটাকে ভালো করে তোলার চেষ্টা করতো। সারা দেশে তখন একটি দুটি ভালো স্কুল না থেকে অসংখ্য ভালো স্কুল গড়ে উঠতো।

চ) আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এখন পরীক্ষার চাপে রীতিমত জর্জরিত। উচু ক্লাশে ওঠার পর পরীক্ষার ব্যাপারটি ঠিক আছে কিন্তু নিচু ক্লাশগুলো থেকে পরীক্ষা পুরোপুরি তুলে দেয়া হোক যেন বাচ্চারা পরীক্ষার ভয়ে আতংকিত হয়ে লেখাপড়া না করে শেখার জন্যে আগ্রহ নিয়ে লেখাপড়া করে।

(এই প্রস্তাবটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে - লেখাপড়া ঠিক ভাবে করানো হচ্ছে কী না সেটি যাচাই করার জন্যে পরীক্ষার একটা ভূমিকা থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে সেটা বাড়াবাড়ি একটা পর্যায়ে চলে গেছে! বিশেষ করে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাবার কারনে পরীক্ষাগুলোর আর কোনো গুরুত্ব নেই।)

এখানে আধ ডজন প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে, এ ছাড়াও আরো নানা ধরনের প্রস্তাব ছিল। মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে সবগুলো প্রস্তাব খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।

যদি এগুলো সত্যি সত্যি কার্যকর করা হয় আমার ধারনা এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হবে।

২।

আমাদের দেশের জ্ঞানী গুণী মানুষেরা শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে হলেই দুটো ভয়ংকর প্রতিবন্ধকতার কথা মনে করিয়ে দেন। তার একটি হচ্ছে গাইড বুক অন্যটি হচ্ছে কোচিং সেন্টার। কিন্তু এই দেশের সব মানুষ কী জানে মুখে গাইড বইয়ের বিরুদ্ধে কথা বললেও দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলো যে শিক্ষা সংক্রান্ত পাতা এর নামে পুরোপুরি গাইড বইয়ের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে? গাইড বই যেরকম ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করতে শেখায় এই পত্রিকাগুলোও সেরকম প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করতে শেখায়। গাইড বই যেরকম টাকা দিয়ে কিনতে হয় এই পত্রিকাগুলোও টাকা দিয়ে কিনতে হয়। ব্যাপারটা কতো গুরুতর দেখার জন্যে আমি আজকের (১লা আষাঢ়, বর্ষার প্রথম দিন, ভেবেছিলাম সব পত্র পত্রিকা তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় কদম ফুলের ছবি দিয়ে বর্ষাকে স্বাগত জানাবে! জানায়নি, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা সবকিছুকে তুচ্ছ করে ফেলেছে।) একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হাতে নিয়েছি। পড়াশোনা সংক্রান্ত অংশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিজ্ঞানের প্রশ্ন হিসাবে শূণ্যস্থান পূরণ করার জন্যে প্রথম প্রশ্নটি এরকমঃ “আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ____ ছড়িয়ে আছে।” আমাকে শূণ্যস্থানটি পূরণ করতে দেয়া হলে আমি পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম, আমাদের চারপাশে অনেক কিছু ছড়িয়ে থাকতে পারে যার প্রত্যেকটি শুদ্ধ উত্তর হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার “গাইড বই” ঠিক প্রশ্নটির নিচেই উত্তর লিখে দিয়েছে, “রোগজীবানু”! ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা করার জন্যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয় নি তাহলে উত্তরটি অন্য কোথাও থাকতো - শুণ্যস্থান পূরণ করে ছাত্রছাত্রীরা পরে মিলিয়ে দেখতো শুদ্ধ হয়েছে কী না। প্রশ্নের ঠিক নিচে উত্তর লেখা আছে - চিন্তা করার সুযোগ নেই - মুখস্ত করার জন্যে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের ২৫টি এবং ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ১৭টি প্রশ্ন ঠিক এরকম। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেটের প্রশ্নগুলো বহু নির্বাচনী এবং সেখানেও একই ব্যাপার। প্রশ্নের সাথেই উত্তর, নিজেকে যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই। দেশে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ার পর আমাকে সবাই অভিযোগ করেছে যে দেশে সৃজনশীল পরীক্ষারও গাইড বই বের হয়ে গেছে। আমি এখনো নিজের চোখে সেটা দেখিনি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার শিক্ষাপাতায় এই প্রথম সৃজনশীল প্রশ্নের গাইড বই কী রকম হয় সেটা দেখার অভিজ্ঞতা হল। ৬ষ্ট শ্রেণীর ইংরেজীর একটি প্রশ্ন এরকমঃ What are computers must from? অনেকে মনে করতে পারেন ছাপার ভুলে এরকম বিদঘুটে একটা ইংরেজী বাক্য লেখা হয়ে গেছে। আসলে ছাপার ভুল নয়, কারন উত্তরটাও সাথে সাথে দেওয়া হয়েছেঃ Computers are must from word processing to nuclear weapon। যিনি লিখেছেন তিনি এটাকে শুদ্ধ জেনেই লিখেছেন। পত্রিকা সেটা আরো গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে।

গাইড বই সরকার থেকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। যদি এটা সত্যিই বেআইনী হয়ে থাকে তাহলে পত্রিকাগুলো যখন গাইড বইয়ের দায়িত্ব পালন করে তখন সেটাকে কেন বেআইনী বিবেচনা করে তাদের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নেওয়া যায় না?

(আমি জানি আমার নির্বোধের মত কথা শুনে সবাই অট্টহাসি হাসছেন, যে সংবাদপত্রগুলো আমাদের দেশের মানুষের চিন্তাভাবনাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যায়, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার সময় অন্য সব কিছুকে গুরুত্বহীন করে ফেলার ক্ষমতা রাখে, উঁচু জায়গায় ভিনদেশী জাতীয় পতাকা উড়াতে গিয়ে তরুনেরা রুটিন মাফিক ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা যাবার পরও এই রাষ্ট্রবিরোধী কাজগুলোকে উৎসাহ দিয়ে যায় - সেই সংবাদপত্রগুলো গাইড বই হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা নিশ্চয়ই অনেক বড় নির্বুদ্ধিতার কাজ!)

৩।

আমি নিশ্চিত ভাবে জানি পদ্মা সেতু কিংবা মেট্রো রেল নয় রুপপুর পারমানবিক শক্তি কেন্দ্র কিংবা রামপালের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নয় - এই দেশের ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের লেখাপড়াই শুধুমাত্র দেশের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে। জিডিপি এর ৬ শতাংশ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে করা হবে সেরকম অঙ্গীকার করা হলেও বাংলাদেশ সরকার তার জিডিপি এর মাত্র ২.২ শতাংশ শিক্ষার জন্যে খরচ করে। এই হিসেবে বাকী পৃথিবী যদি বাংলাদেশকে অশিক্ষিত অসভ্য এবং বর্বর দেশ হিসেবে গালাগাল করে আমাদের সেটা মাথা পেতে নিতে হবে। অনেক চেচামেচি করেও শিক্ষা খাতে বাড়তি টাকা আনা যাচ্ছেনা সেজন্যে আমরা মাঝে মাঝেই চিন্তা করি ব্যক্তি উদ্যোগ কিংবা স্বেচ্ছাশ্রমে আমাদের কিছু করার আছে কী না। এ ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বড় উৎসাহ পেয়েছি রাগিব হাসান নামে আলাবামা ইউনিভার্সিটির একজন তরুণ শিক্ষকের কাছ থেকে। ব্যাপারটি ঘটেছে এভাবেঃ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে ব্রেইল বই দরকার যে বইগুলো স্পর্শ করে পড়া যায়। বছরের শুরুতে সবাই নূতন বই পেলেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা নূতন দূরে থাকুক কোনো বইই পায় না! তাদের কাতর অনুরোধ শুনতে কেউ রাজী নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের পাঠ্যবইগুলো ছাপিয়ে দেওয়া যায় কী না সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা শুরু হলে এনসিটিবি থেকে পাঠ্যবইগুলোর ইলেকট্রনিক সফট কপি চাওয়া হলে তারা কোনো সাহায্য করতে পারল না। তাদের ওয়েব সাইটে সব পাঠ্যবইয়ের পিডিএফ কপি রয়েছে কিন্তু সেগুলো থেকে ব্রেইল বই ছাপানো সম্ভব না। এরকম একটা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ হাল ছেড়ে দেয় কিন্তু রাগিব হাসানের মত নূতন প্রজন্মের তরুণেরা হাল ছাড়ে না। সে নেটওয়ার্কে সারা পৃথিবীর সব বাংলাদেশী তরুণদের অনুরোধ করল বাংলা পাঠ্যবইগুলো টাইপ করে দিতে। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মাঝে সবাই মিলে সেই বইগুলো টাইপ

করে দিল। বছরের পর বছর কাতর অনুনয় বিনুনয় করে এনসিটিবি থেকে যেটি পাওয়া সম্ভব হয় নি, বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ তরুণীরা অল্প কয়েকদিনে সেটা উপহার দিয়ে দিল! এই পুরো প্রক্রিয়াটার নাম crowd sourcing - এটাও আমি রাগিব হাসানের কাছ থেকে শিখেছি। অসংখ্য মানুষ মিলে আপাতত দৃষ্টিতে অসম্ভব একটা কাজ করে ফেলা!

এর পর থেকে আমার মাথার মাঝে অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ তরুণীরা দেশের জন্য কিছু করতে চায়, তাদের এই ভালোবাসা আর আগ্রহকে ব্যবহার করে আমরা কী শিক্ষার জন্যে নূতন কিছু করতে পারি না? প্রতি বছর যে পাঠ্য বইগুলো লেখা হচ্ছে সেগুলো এখনো দায়সারা, সেই বইগুলো কী নূতন করে লেখা যায় না ? বিজ্ঞানের নানা এক্সপেরিমেন্ট এর বর্ণনা থাকে সেগুলো বাচ্চারা করার সুযোগ পায় না, অন্ততপক্ষে তার ভিত্তিগুলো কী তৈরী করা যায় না ? কিংবা দেশের জন্যে সবচেয়ে যেটা জরুরী, গাইড বই এবং কোচিং সেন্টারকে চিরতরে দূর করে দেয়া যায় না ? আইন করে সেগুলো বন্ধ করা হয়ত কঠিন কিন্তু তাদেরকে পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালে পালটে দেয়া তো কঠিন কিছু নয়।

গাইড বই মানে কী ? যারা সেটা জানেন না তারা সেটা গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকার শিক্ষা পাতাগুলো দেখলেই এখন জেনে যাবেন - বাজার থেকেও বই আকারে সেগুলো কেনা যায়। ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে প্রশ্ন আর উত্তর মুখস্থ করে।

(অনেকে কৈফিয়ত দেয়ার জন্যে বলে প্রশ্নটা কোন কাঠামোতে হয় সেটা দেখার জন্যে তারা গাইড বই পড়ে !)

আমরা কী crowd sourcing করে সারা পৃথিবীর আগ্রহী তরুণদের থেকে চমৎকার কিছু প্রশ্ন তৈরী করিয়ে নিতে পারি না ? সেগুলো তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছেলেমেয়েদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিতে পারি না ? এই প্রশ্নগুলোর শেষে উত্তর দেয়া থাকবে না তাই তারা কখনোই সেগুলো মুখস্ত করতে পারবে না - কিন্তু ইচ্ছে করলেই পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নিতে পারবে, কোথায় দুর্বলতা নিজেরাই বের করে নিতে পারবে। আমি শ খানেক প্রশ্নের কথা বলছি না - হাজার হাজার প্রশ্নের কথা বলছি।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়ার বিষয়টির খোঁজখবর নিতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করেছি আমাদের শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয় সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরী করতে, যে কারণে সৃজনশীল গাইড (এবং গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকা!) এতো জনপ্রিয়। শিক্ষকদের কেমন সমস্যা হয় সেটি আমি জেনেছি আমার বোনের মেয়ের কাছ থেকে, সে যখন ছোট তখন একদিন তার ধর্ম স্যার ক্লাশের সব মেয়েদের বললেন, "ধর্ম পরীক্ষার জন্য তোরা সবাই সৃজনশীল প্রশ্ন করে আনবি - যারটা ভালো হবে সেটা আমি

নিব, পরীক্ষায় দিব।” বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মহা আনন্দে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরী করে নিয়ে এল, শিক্ষক সেখান থেকে বেছে বেছে নিয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরী করলেন। সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরী করতে শিক্ষকদের কালো ঘাম ছুটে যায় কিন্তু বাচ্চাদের কোনো সমস্যা হয় না। তাই যদি crowd sourcing করে সারা পৃথিবীর সব তরুনদের তৈরী করা সব বিষয়ের অসাধারণ কিছু প্রশ্ন জমা করে রাখা যায় - তাহলে ছাত্রছাত্রীরা সেগুলো দিয়ে নিজের জ্ঞানটুকু পোক্ত করতে পারবে, শুধু তাই নয় প্রয়োজনে শিক্ষকেরাও সেটা ব্যবহার করতে পারবেন। তাদের জন্যে আলাদা ব্যাবস্থাও করে দেয়া যাবে, বাজে প্রশ্নের অভিশাপ থেকে মুক্তিও পেয়ে যাবেন।

আমি খুব সৌভাগ্যবান কারণ আমি খুব উৎসাহী কিছু মানুষের আশেপাশে থাকি, অসংখ্য ভাবনা চিন্তা আমাদের মাথায় কাজ করে। বাংলাদেশের সব তরুণদের নিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাহায্য করা ঠিক এরকম একটা চিন্তা ভাবনা। যদি এরকম একটা উদ্যোগ নেয়া হয় তাহলে কী দেশের তরুণেরা এগিয়ে আসবে না?

নিশ্চয়ই আসবে!

কয়েক টুকরো ভাবনা

১.

গত কিছুদিন থেকে আমাকে সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে, "ওয়ার্ল্ড কাপে আপনি কোন দলকে সাপোর্ট করেন?" আমি তখন রীতিমত সমস্যায় পড়ে যাই, সারা পৃথিবী যখন ওয়ার্ল্ড কাপের উত্তেজনায় ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে, খবরের কাগজের মূল অংশই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপের খুঁটিনাটি তখন আমি যদি বলি আমার ওয়ার্ল্ড কাপে পছন্দের দল নেই তখন সবাই আমার দিকে কেমন জানি অন্য রকম চোখে তাকায়! সবারই ধারণা হয় আমার নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে। ওয়ার্ল্ড কাপ বিষয়টাই আমার জন্যে হৃদয়-বিদারক, এমনিতে টেলিভিশন দেখা হয়না, কোথাও গিয়ে যদি দেখি সবাই টেলিভিশনে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছে তখন আমাকেও দেখতে হয়। এমনিতে পছন্দের কোনো দল নেই কিন্তু খেলা দেখার সময় যে দলটা একটু দুর্বল তার জন্যে কেমন জানি মায়া হয় এবং নিজের অজান্তেই এক সময় তার পক্ষ নিয়ে নিই। অবধারিতভাবে আমার দুর্বল দলটি হেরে যায় এবং তখন আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কাজেই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলাটি থেকে আমি এখনো কোনো আনন্দ পাইনি, অনেক দুঃখ পেয়েছি !

ছেলেবেলায় আমি প্রচুর ফুটবল খেলেছি, কখনো খেলার মাঠে ফুটবলে লাথি দিতে পেরেছি বলে মনে নেই কিন্তু লাথি দেবার জন্যে অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছি এবং তাতেই অনেক আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু আজকালকার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা দেখে আমি মাঝে মাঝেই খুব ভাবনায় পড়ে যাই। যে কোনো খেলার মূল কথা হচ্ছে যে দলটি ভালো খেলবে সে জিতবে। ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা দেখি দুই দলই ভালো, কেউ কাউকে গোল দিতে পারছে না, তখন লটারি করে ঠিক করা হচ্ছে কে বিজয়ী! (খেলা শেষে পেনাল্টি কিক দিয়ে জয় পরাজয় ঠিক করা আসলে লটারি ছাড়া আর কিছু না।) পেনাল্টি কিক দেবার বেলায় অনেক সময়েই দেখি গোলকিপার উলটো দিকে ঝাঁপ দিয়েছে - কোন দিকে ঝাঁপ দিবে সিদ্ধান্তটি নিতে হয় কিক দেয়ার আগে, কাজেই পুরোটাই কপালের উপর, পুরোটাই লটারি। যে খেলার জয় পরাজয় ভাগ্যের উপর নির্ভর করে সেই খেলা কেমন করে সত্যিকারের খেলা হতে পারে সেটি আমি কখনো বুঝতে পারিনি। আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও আমি বুঝবো বলে মনে হয় না।

তবে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় বাংলাদেশের চেহারা দেখে আমি সব সময়েই দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কোনো একটা বিচিত্র কারণে এই দেশের অনেক মানুষ মনে করে তারা যে দলটার সমর্থক সেই দলের দেশটির পতাকা টানাতে হবে। শুধু যে টানাতে হবে তা নয়, পতাকাটা হতে হবে অনেক বড়। পতাকা টানাতে গিয়ে ইলেক্ট্রিক শক খেয়ে তরুণেরা মারা গেছে, তার আপনজনের কেমন লেগেছে কল্পনাও করতে পারি না। যশোরের ডিসি এই পতাকা দেখে বিরক্ত হয়ে বলেছেন স্বাধীন দেশে বিদেশী পতাকা এভাবে টানানো

যাবে না, পতাকা নামাতে হবে। তার জন্যে অভিনন্দন, সারা দেশে অন্তত একজন মানুষ আছেন যিনি জানেন পতাকা এক টুকরো কাপড় নয়, পতাকাটা দেশের প্রতীক। পৃথিবীর সবদেশে জাতীয় পতাকার সম্মান রাখার জন্যে নিয়ম কানুন আছে, ইচ্ছেমত কেউ বিদেশী পতাকা তুলে ফেলতে পারে না। বিদেশী পতাকার সাথে নিজের দেশের পতাকাটা আরো উঁচুতে তুলতে হয়, বিদেশী পতাকার থেকে নিজের দেশের পতাকাটা আরো বড় হতে হয়।

আগে একেবারেই ছিল না, তবে আজকাল দেখছি প্রায় অনেক জায়গাতেই বিদেশী পতাকার সাথে বাংলাদেশের পতাকাটাও আছে, দেখে ভালো লাগে। যদি এরকম হতো, যে কয়টি বিদেশী পতাকা আছে ঠিক সেই কয়টা কিংবা তার চেয়ে বেশি আমাদের লাল সবুজ পতাকা উড়ছে তাহলে সেই দৃশ্য দেখে আমাদের বুকটা ভরে যেতো। আমাদের যে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বড় হয়েছে তারা জানে আমাদের লাল সবুজ পতাকার লাল রংটি আসলে মোটেও লাল রংয়ের একটা কাপড় নয়, সেটি আসলে আমাদের আপনজনের বুকের রক্ত দিয়ে রাঙানো। এর মাঝে এক বিন্দু অতিরঞ্জন নেই! সেই জন্যে জাতীয় পতাকাটা আমাদের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ।

২.

যারা ভাবছেন "ওয়ার্ল্ড কাপ" নামক যে বিষয়টি নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই আমি সেটা নিয়েই লিখতে বসেছি আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই। আমি আজকে আমার কিছু টুকরো টুকরো ভাবনার কথা লিখতে চাই। ভিন্ন ভিন্ন কিছু ভাবনা।

কিছুদিন আগে আমার সাথে একটি প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করে আমাকে তাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। "প্রধান অতিথি" "মাঝারী অতিথি" "দায়সারা অতিথি" এই বিষয়গুলো আমার জন্যে বোঝা কঠিন, তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি এই বিভাজন নিয়েই প্রায় খুনোখুনি হবার অবস্থা ঘটতে দেখেছি! যাই হোক এই প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণটি আমি খুব আগ্রহ নিয়ে গ্রহন করলাম কারণ তাদের অনুষ্ঠানে তারা প্রায় দুইশ বাচ্চাকে নিয়ে আসবেন - তাদের সবাই হচ্ছে গৃহকর্মী, সোজা বাংলায় বাসার কাজের মেয়ে। এরকমটি আগে কখনো ঘটেনি।

ঢাকা শহরে ঠিক সময়ে কোথাও পৌছানো অসম্ভব একটি ব্যাপার, বেশী সতর্ক হয়ে অনেক আগে রওনা দিয়ে অনেক আগে পৌছে গেছি না হয় ঠিক সময়ে রওনা দিয়ে দেরী করে পৌছেছি। তবে সেদিন ভাগ্যের জোরে আমি ঠিক সময়ে পৌছে গেলাম। এবং পৌছানোর সাথে সাথে আমাকে স্টেজে তুলে দেয়া হল।

মঞ্চে বসে আমি অনুষ্ঠানের দর্শক শ্রোতাদের দেখতে পেলাম এবং আমার বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। যারা আমার সামনে বসে আছে তাদের বয়স দশ বারো বছর কিংবা আরো কম। এই বয়সের শিশুদের মুখে এক ধরণের সারল্য থাকে, এক ধরণের নির্দোষ কমনীয়তা থাকে, তাদের সবার মুখে সেটা আছে। আমার সামনে যারা বসে আছে তাদের সবাই নিজের বাবা মা ভাইবোনকে ছেড়ে একা একা অন্য একটা পরিবারের বাসায় কাজ করে। যে বয়সে স্কুলে যাবার কথা, বন্ধুদের সাথে হৈ হুল্লোড় করার কথা, মা বাবার আদরে বড় হবার কথা তখন তারা কাপড় কাচে, বাসন ধোয় রান্না করে, ফাই ফরমাশ খাটে। আয়োজকরা আমাকে জানালেন এদের অনেকেই জানে না তারা কোথা থেকে এসেছে, তাদের দেশ কোথায়, বাবা মা পরিজন কোথায় থাকে! তারপরও তারা হচ্ছে এ দেশের গৃহকর্মীদের বা কাজের মেয়েদের মাঝে সৌভাগ্যবানেরা। তারা যে পরিবারের সাথে কাজ করে তারা এই কাজের মেয়েদের এই সংগঠনের সাথে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে, সময় করে লেখা পড়া করতে দিয়েছে, এই সংগঠনের সাথে খানিকটা বিনোদনের জন্যে ঘর থেকে বের হতে দিয়েছে। সে জন্যে আজকে আমি তাদের দেখার সুযোগ পেয়েছি। অন্যদের আমরা কখনো দেখব না, তাদের কথা শুনব না।

আয়োজকেরা জানালেন এই বাচ্চাদের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের যাদুঘর দেখিয়ে আনা হয়েছে, আমাকে অনুরোধ করলেন তাদেরকে কিছু একটা বলতে - সম্ভব হলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে।

আমি শিক্ষক মানুষ, মাস্টারী করি, আমার কাজ কথা বলা, যে কোনো জায়গায় জানি আর না জানি কিছু একটা বলে ফেলতে পারি, কিন্তু আজকে এই মূহুর্তে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার বলার কিছু নেই। এই বাচ্চাগুলো যদি কোন স্কুলের বাচ্চা হতো আমি তাদের স্বপ্নের কথা বলতে পারতাম, ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতাম, কিন্তু যে বাচ্চা বাসায় কাজ করে তার জীবন কাটায় তাকে আমি কী মিথ্যা স্বপ্ন দেখাব? একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের মত মানুষের সামনে নূতন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, সুন্দর ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়েছে, কিন্তু এই ছোট শিশুদের জীবনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার কি কিছু আছে? আমি কী তাদের কোনো আশার কথা বলতে পারব ? সারা জীবনে যেটি কখনো হয়নি, আজকে আমার সেটি ঘটে গেল - আমি তাদের বলার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না। অবান্তর একটি দুটি কথা বলে তাদের জিজ্ঞেস করলাম, “তোমরা কী পড়তে পার?” সবাই চিৎকার করে বলল, “পারি!” কী অসাধারণ একটি ব্যাপার - এই প্রথমবার আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, “আমি তোমাদের সবার জন্যে একটা করে বই এনেছি! তোমরা আস, আমি তোমাদের একটা করে বই উপহার দিই।”

অনুষ্ঠানের সব শৃংখলা ধ্বসে গেল, বাচ্চাগুলো ছুটে এলো, আয়োজকেরা তাদের লাইন করিয়ে দিলেন, আমি তাদের হাতে একটি একটি বই তুলে দিলাম। আহা, কী মায়াকাড়া চেহারা কিন্তু নিষ্ঠুর পৃথিবীর তাদেরকে দেবার মত কিছু নেই। বাচ্চাগুলোর কিন্তু মুখে হাসি, তাদের কোন অভিযোগ নেই, এই জীবন নিয়ে অভিযোগ করা যায় সেটি তারা জানেও না। শুধু একজন আমার কাছে জানতে চাইল, “আমরা এখন

ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত পড়তে পারি। যদি আরো পড়তে চাই তাহলে কোথায় পড়বো?" আমি তাকে আশ্বস্ত করে কিছু একটা উত্তর দিয়ে এসেছি, একটি মেয়ের লেখাপড়া হয়তো অনেকভাবেই করা সম্ভব, কিন্তু তার মতো অন্যদের কে আশ্বস্ত করবে ?

আয়োজকেরা বাচ্চাদের দিয়ে একটা অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন, সেই অনুষ্ঠান দেখে কে বলবে তাদের জীবন কাটে বাসায় কাজ করে! ছোট একটি শিশুকে একটুখানি সুযোগ দেয়া হলে তারা কতো কী করে ফেলতে পারে ? এই দেশের সব শিশুদের আমরা কখন সেই সুযোগ করে দেব ?

৩.

ঢেকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে - কাজেই আমি কিছু একটা লিখতে বসেছি লেখা পড়া নিয়ে যদি কিছু না বলি সেটা কেমন করে হয় ?

খবরের কাগজে দেখেছি সংসদে প্রশ্নপত্র ফাসঁ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এই পাচঁ বছরে এই প্রথমবার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। খবরটি পড়ে আমার খুব মন খারাপ হয়েছে কারন আমি নিশ্চিত ভাবে জানি এই পাচঁ বছরে আরো অনেকবার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। আমার মতো আরো অসংখ্য ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকেরাও জানে - তারা যখন খবরের কাগজে এই খবরটি পড়বে তখন তাদের কী মনে হবে? আমাদের মাননীয় মন্ত্রী একটি সত্যকে অস্বীকার করছেন নাকী তার থেকেও বেদনাদায়ক ব্যাপার, দেশের শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পরও এই গুরুত্বপূর্ন সত্যটির কথা কেউ তাকে জানায়নি ? কোনটি বেশী বেদনাদায়ক ?

আমরা সবাই প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে, রিপোর্টে বলা হয়েছে শুধু ইংরেজী এবং গণিতের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে - অথচ আমি নিজে খবরের কাগজে পদার্থ বিজ্ঞানের ফাঁস হয়ে যাওয়া চারটা প্রশ্ন সত্যিকার প্রশ্নের পাশাপাশি ছাপিয়েছিলাম। ফাঁস হয়ে যাওয়া অন্যান্য প্রশ্নগুলোও আমি ছাত্রদেরকে দিয়ে তদন্ত কমিটির হাতে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম! হাতে প্রমান থাকার পরও তদন্ত কমিটি এই সত্যগুলো উদ্ঘাটন করতে পারেনি - আমরা এখন তাদের কাছে খুব বেশী কিছু কি আশা করতে পারি ?

৪.

এইচ.এস.সি এর লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে, এখন ব্যবহারিক পরীক্ষা চলছে বা শেষ হয়েছে। আমার মনে হয় এই দেশে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিষয়টাও দেশের মানুষের জানা দরকার। আমি নিজেই লিখতে পারি কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় যারা এই পরীক্ষা দেয় তাদের নিজেদের মুখে শোনা। একজনের ই-মেইল এরকমঃ "প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষায় আমাদের কোন পরীক্ষা করতে হয় না। ফিজিক্সে আমরা বই দেখে কলেজে করা পরীক্ষার মানগুলো বসিয়ে দিই। কেমেষ্ট্রি ফার্স্ট পেপারে পিওন বলে দেয় মান কী রকম হবে, একটু এদিক সেদিক করে লিখে দেই। সেকেন্ড পেপারে লবন শনাক্তকরণ থাকে, পিয়ন বলে দেয় কোনটা কী লবণ। আর সব পরীক্ষার বর্ণনাই লিখি বই, খাতা বা ফোনে তোলা ছবি দেখে। এজন্যে প্রতি পরীক্ষায় একশো টাকা দিতে হয়। চার বিষয় X দুই পত্র = ৮০০ টাকা। কী ব্যবসা দেখেছেন ? পিওন না শুধু শিক্ষকরাও জড়িত।"

একজন ছাত্র বা ছাত্রী যখন জানে তাদের শিক্ষকেরা দুর্নীতির সাথে জড়িত তখন সেই শিক্ষার কী আসলে কোনো গুরুত্ব আছে ? বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ব্যবহারিক পরীক্ষায় ২৫ নম্বর থাকে। ১০০ এর ভেতর এই ২৫ মার্ক সরাসরি টাকা দিয়ে কেনা যায় - সবাই এটি জানে। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক - কেউ বাকী নেই, কিন্তু কেউ কিছু করে না। তারপরও আমরা শিক্ষা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলি - আমার দুঃখটা সেখানে।

৫.

আমি যখন ঢাকা যাই তখন আমার মায়ের সাথে দেখা করার জন্যে মীরপুর ফ্লাই ওভারের উপর দিয়ে যাই। মীরপুরে পৌছানোর পর আমি যে রাস্তাটি ব্যবহার করি সেটি বিহারী এলাকার ভেতর দিয়ে যায়- আমি সেটি আগে জানতাম না, এখন জানি। বেশ রাতে আমি একদিন যাচ্ছি দেখি রাস্তায় অনেক মানুষের ভীড়। মানুষের ভীড় দেখেই বোঝা যায় ভীড়টির গতি প্রকৃতি কী রকম, কখনো হয় নির্দোষ আনন্দোল্লাস, কখনো হয় ক্ষুব্ধ মানুষের জটলা। আমি বুঝতে পারলাম এই ভীড়টির ভেতরে এক ধরনের ক্ষোভ রয়েছে - ভীড় ঠেলে ক্ষুব্ধ মানুষের ভেতর দিয়ে আমি যখন গাড়ী নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি, আমার ড্রাইভার জানালো এই ভীড়ের মাঝে মানুষজনের সাথে কথা বলছেন স্থানীয় এমপি। এর মাঝে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই, একজন এমপি তার এলাকায়, তার মানুষের সাথে কথা বলতেই পারেন, তাদের ভেতর কোনো ক্ষোভের জন্ম নিলে তাকেই তো সেটা প্রশমিত করার জন্যে আসতে হবে।

ঠিক তার কয়েকদিন পর শবে বরাতের রাত পার হয়ে যে ভোর এসেছে সেই ভোরে বিহারীদের এলাকায় দশজন মানুষকে পুড়িয়ে মারা হল। এর মাঝে মহিলা আছে, শিশু আছে, কিশোর-কিশোরী আছে। সেই

ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি শবেবরাতের রাতে পরের বছরের জন্যে ভাগ্য বেটে দেয়া হয়, বিহারী পল্লীর মোঃ ইয়াসিন নামের মানুষটি জানতো না তার পরিবারের জন্যে কী ভয়ংকর নির্মম একটি ভাগ্য কয়েক ঘন্টা আগে শবেবরাতের রাতে তাদের কপালে লিখে দেয়া হয়েছিল। আমি কারো নাম মনে রাখতে পারি না কিন্তু পুড়িয়ে মারা মানুষগুলোর মাঝে লালু ভুলু নামে দুজন জমজ শিশুর নাম আছে, সেই নামগুলো আমার স্মৃতির মাঝে গেঁথে গেছে - আমি মনে হয় সেটা কখনো ভুলতে পারব না। এই নির্মম পৈশাচিকতাটি কেমন করে ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করেছি, বুঝতে পারিনি। এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়, এই এলাকায় যে এক ধরনের উত্তেজনা ছিল আমি সেটা নিজের চোখে দেখেছি, কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সেখানে দেখেছি এই ভয়ংকর পৈশাচিক ঘটনার জন্যে ছয়জন বিহারীকেই ধরে নেয়া হয়েছে, মনে হচ্ছে এখানে খুব বড় ধরনের একটি অন্যায়, খুব বড় একটা অবিচার হতে যাচ্ছে। সেটি থামানোর কোনো পথ নেই।

আমরা সবাই জানি ১৯৭১ সালে এই বিহারী সম্প্রদায় বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। এই পুরো এলাকার অসংখ্য বাঙালীদের হত্যা করা হয়েছিল এমনকী স্বাধীনতার পরও ২০ জানুয়ারী এখানে জহির রায়হান সহ অনেকে খুন হয়েছেন, হারিয়ে গেছেন। এখনও সেই এলাকায় বধ্যভূমি খুঁজে পাওয়া যায়। বিহারীদের অনেকেই এখনো নিজেদের পাকিস্তানী মনে করে, তারা পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায় কিন্তু পাকিস্তান সরকারের এই বিহারীদের ফিরিয়ে নেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। গত চার দশক থেকে এই বিহারী সম্প্রদায় এখানে ক্যাম্পে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে।

চার দশক দীর্ঘ সময়। একাত্তরে যারা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাদের সংখ্যা এখন খুব বেশী থাকার কথা নয় - এখন এখানে নূতন প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে। তারা এই দেশের মাটিতে জন্মেছে, এই দেশে সম্মান নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের সবার উপর দায়িত্ব এই মানুষগুলোকে আমাদের দেশে আমাদের সমাজে সম্পৃক্ত করে নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরকে গড়ে ওঠার অধিকার দেয়া। আমি নিশ্চিত যারা নূতন প্রজন্ম তাদের নিশ্চয়ই পাকিস্তান যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই - পাকিস্তান নামক দেশটির এমন অবস্থা যে যারা পাকিস্তানের অধিবাসী তারাই এখন এই দেশ থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাচেঁ! সরকার হোক, মানবাধিকার কর্মী হোক সবাই মিলে ক্যাম্পে রিফিউজি হিসেবে কয়েক যুগ থেকে বাস করা মানুষগুলোর জীবনে একটুখানি স্বস্তি, একটুখানি স্বপ্ন, একটুখানি আশা ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ। পূর্ব পুরুষের অপরাধের জন্যে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তার প্রায়শ্চিত্য করতে হবে - সেটি তো কোনোভাবে আমরা মেনে নিতে পারি না।

স্বাধীনতার আগে বিহারীদের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকভাবে দেখা হতো - তখন তারা বাংলা বলতো না। বাংলা না জেনেই তারা যেন এই দেশে জীবন কাটাতে পারে পাকিস্তান সরকার নানাভাবে

সেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আমি এখন যখন বিহারী এলাকার ভেতর দিয়ে যাই তখন দেখি তারা চমৎকার বাংলা বলতে পারে!

মিরপুরে তাদের এলাকার ভেতর দিয়ে দুই লেনের একটি রাস্তা গিয়েছে, দশ জন বিহারী শিশু কিশোর মহিলাকে পুড়িয়ে মারার পর একটি লেন সম্ভবত তারা প্রতিবাদ হিসেবে বন্ধ করে রেখেছে, সেখানে বাংলায় লেখা অনেক ব্যানার ঝুলছে। সেদিন যাবার সময় দেখলাম একটা শোকসভা হচ্ছে, বিহারী বক্তারা চমৎকার বাংলায় তাদের বক্তব্য দিচ্ছেন। তারা আসলে পুরোপুরি আমাদের মানুষ হয়ে গিয়েছেন।

তাহলে কেন তাদের ভিন দেশী মানুষ হিসেবে আমাদের এই দেশে কষ্ট দিয়ে যাব ? স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে আমরা অনেক কষ্ট করেছি - আমরা সেই কষ্ট করেছি যেন পরের প্রজন্মকে কষ্ট করতে না হয়। কেন তাহলে আমরা নূতন প্রজন্মকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি ?

আমরা যারা স্বার্থপর

১.

আমি আজকে যেটা নিয়ে লিখছি সেটা নিয়ে লেখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কী না আমি বুঝতে পারছি না। আমার বুদ্ধি খুব বেশী সেটা কখনই কেউ বলেনি (যাদের বুদ্ধি খুব বেশী তারা যে খুব শান্তিতে থাকে তাও নয়), তবে কিছু একটা লেখালেখি করে আমি সেটা পত্রপত্রিকায় ছাপিয়ে ফেলতে পারি। সে জন্য আমি যেন দায়িত্বহীনের মত কিছু লিখে না ফেলি আমার সবসময় সেটা লক্ষ রাখতে হয়। আমার চেয়ে অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে লিখেও অনেকে তাদের লেখা পত্রপত্রিকায় ছাপাতে পারেন না। তারা মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে আমার কাছে সেই লেখাগুলো পাঠান। আামি পড়ি এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আজকাল লেখাগুলো শুধু যে কাগজে ছাপা হয় তা নয়, সেগুলো ইন্টারনেটেও প্রকাশ হয়। সেখানে একটা নূতন স্টাইল শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটা লেখার পিছনে লেজের মত করে পাঠকেরা তাদের মন্তব্য লিখতে পারেন। আমি এখন পর্যন্ত কখনোই আমার লেখার পিছনের লেজে লেখা পাঠকদের মন্তব্য পড়িনি, কখনো পড়বনা বলে ঠিক করে রেখেছি। পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই যে নিজের সম্পর্কে ভালো কিছু শুনতে চায়না, তাই সেই মন্তব্যগুলো পড়লে আমি হয়তো নিজের অজান্তেই এমনভাবে লিখতে শুরু করব যেন সবাই আমার লেখা পড়ে ভালো ভালো মন্তব্য করে। আমি সেটা চাইনা, আমার যেটা লিখতে ইচ্ছা করে আমি সেটা লিখতে চাই। আমার সব কথাই যে সবার জন্যেই সত্যি হবে সেটা তো কেউ বলেনি। আমার কথাটা সবাইকে মেনে নিতে হবে সেটাও আমি বলছি না, শুনতে নিশ্চয়ই সমস্যা নেই !

এতো লম্বা একটা ভূমিকা দিচ্ছি তার কারণ আজকে আমি যাদের নিয়ে লিখছি তারা সবাই আমার সহকর্মী, তাদের সাথে আমার ওঠাবসা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমার লেখাটি পড়ে তারা হয়তো একটু ক্ষুব্ধ হবেন - খানিকটা আহত বোধ করবেন তাই আগে ভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কয়েকদিন আগে আমার টেলিফোনে একটা এস.এম.এস. এসেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাংগনে সব শিক্ষকদের একটা মানব বন্ধনে যোগ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদিও এস.এম.এস.টি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এটি শুধু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রোগ্রাম নয় - এটি ইউনিভার্সিটি ফেডারেশানের প্রোগ্রাম, অর্থাৎ বাংলাদেশের সব পাবলিক ইউনিভার্সিটির সব শিক্ষক সমিতির সম্মিলিত একটি প্রোগ্রাম। মানববন্ধনে দুটি দাবীর কথা বলা হয়েছে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে আলাদা বেতন স্কেল, দ্বিতীয়টি তাদের শিক্ষকতা জীবন বাড়িয়ে ৬৭ বছর করে দেয়া। আমি এই দুটি দাবী নিয়ে আমার নিজের কথাগুলো বলতে চাই।
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কতো ? প্রকৃত সংখ্যাটি বলা রুচিহীন কাজ হবে তাই

অন্যভাবে বলি। আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক, আমার ছাত্রছাত্রীরা যখন কোথাও চাকরী পেয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসে, আমি তখন তাদের জিজ্ঞেস করি, "তোমার বেতন আমার থেকে বেশী তো ?" তারা একটু লজ্জা পায়, কিন্তু প্রায় সবসময়েই মাথা নেড়ে জানায় যে তাদের বেতন আমার থেকে বেশী! আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সিনিয়র শিক্ষক, যতদূর জানি আমার বেতন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সর্বোচ্চ বেতন! সত্যি মিথ্যা জানি না, শুনেছি সচিবালয়ের একজন মাঝারী আমলা তার গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে আমার বেতন থেকে বেশী টাকা পান।

আমাদের পাশের দেশ ভারতবর্ষের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একবার গিয়েছিলাম, সেখানকার লেকচাররা সবাই নিজের গাড়ী চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন ! সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন আমাদের বেতন থেকে আনুমানিক চারগুন বেশী ! সেই দেশটি সূঁই থেকে গাড়ী সবকিছুই নিজেরা তৈরী করে, তাই সে দেশে বেঁচে থাকার খরচ আমাদের থেকে কম। অনেকদিন আগে আমি একবার পত্রিকায় লিখেছিলাম, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের বেতন একজন গাড়ীর ড্রাইভারের বেতন থেকে কম। মনে আছে পরের দিন একজন লেকচারার শুকনো মুখে আমার কাছে ছুটে এসেছিল, হাহাকার করে বলেছিল, "স্যার, আপনার লেখা পড়ে আমার বিয়ে ভেংগে গেছে!"

তবে কেউ যেন ভুল না বুঝেন, বিয়ের বাজারে কদর কমে যাবে জেনেও কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভালো ছাত্র এবং ছাত্রীরা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে চায়। সম্ভবত এটাই হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি! তবে এই শক্তি কতোদিন থাকবে আমি জানি না। একজন ছাত্র বা ছাত্রী সবার চাইতে ভালো পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও আজকাল আর নিশ্চিন্ত হতে পারে না সে কী আসলেই শিক্ষক হতে পারবে কি না। নিজের সমস্ত আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে দলবাজী করে এমন শিক্ষকদের পাশে তাদের ঘুরঘুর করতে হয়। নিয়োগ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের পকেটে নিজেদের প্রার্থী থাকে। তারা সরাসরি একে অন্যের সাথে দরদাম করেন, বলেন, “আমার একজনকে নেন, তাহলে আমি আপনার একজনকে নিতে দেব।” বাইরে ছাত্রনেতারা বসে থাকে, মন্ত্রীরা ফোন করে, সাংসদেরা হুমকি দেয়। তাই পত্রিকায় একজন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়া হলেও হালি হিসেবে শিক্ষক নিতে হয়। যারা সত্যিকারের ভালো মেধাবী শিক্ষক, তারা শেষ পর্যন্ত আরো ভালো জায়গায় চলে যায়, অপদার্থরা থেকে যায়। দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপদার্থ শিক্ষকের আড্ডাখানা হয়ে যায়। তাতে কোন সমস্যা নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমোশনের নিয়ম খুবই উদার, বয়স হলেই লেকচাররা দেখতে দেখতে প্রফেসর হয়ে যায়!

যাই হোক, আমি অবশ্যি শিক্ষকদের বেতন নিয়ে কথা বলতে বসেছি, তারা কি পদার্থ না অপদার্থ সেটা নিয়ে কথা বলতে বসিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এক সময় খুব সম্মানিত মানুষ ছিলেন, এখন আর সেরকম সম্মানী মানুষ নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বললেই চোখের সামনে একজন জ্ঞান তাপস গবেষক

এবং নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকের চেহারা ফুটে না উঠে কূটিল-কৌশলী-দলবাজ-রাজনৈতিক মানুষের চেহারা ফুটে উঠে। যে চেহারাই ফুটুক, এই বেচারাদের সংসার খরচ চালাতে হয়, খানিকটা ঠাট বজায় রাখতে হয়, সেজন্য তাদের একটা সম্মানজনক বেতন দরকার। খুব উচ্চমহলে সেটা নিয়ে দেন দরবার করার পর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা মিলিয়ন ডলার উপদেশ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "আপনাদের বেতন বাড়ানোর কোনো রাস্তা নেই। পরীক্ষার খাতা-ফাতা দেখার সময় বেশী বেশী টাকা বিল করে কোনোভাবে পুষিয়ে নেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সেই মিলিয়ন ডলার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তারা পরীক্ষার খাতা দেখার জন্যে টাকা নেন, পরীক্ষার গার্ড দেওয়ার জন্যে টাকা নেন। পৃথিবীর সব দেশে পরীক্ষার খাতা একবার দেখা হয়, এই দেশে সেটা দুইবার দেখা হয়, কোনো কোনো সময় তিনবার !

আমি নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের পড়াই, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম সব সময় তক্কে তক্কে থাকতাম কিভাবে লেখাপড়া না করেই কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। আজকালকার ছাত্রছাত্রীদের খুব একটা উন্নতি হয়নি, তারাও তক্কে তক্কে থাকে কীভাবে পড়াশোনা না করে ছাত্রজীবনটা ম্যানেজ করে ফেলা যায়। তাদেরকে জোর করে লেখাপড়া করার অমোঘ অস্ত্র হচ্ছে ঘনঘন ক্লাশ টেস্ট নেওয়া, আমি সেটা করি এবং আমার ধারণা মুখে স্বীকার না করলেও আমার ছাত্রছাত্রীরা সে জন্যে কখনো আমাকে ক্ষমা করেনি। খুবই বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করেছি যে এখন নাকি ক্লাশ টেস্ট নিলেও টাকা পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নানা ধরণের কমিটিতে থেকে কাজ করতে হয়, আজকাল দেখছি কমিটিতে বসে মিটিং করলেই একটা পেট মোটা খাম ধরিয়ে দেয়া হয়। আমি অপেক্ষা করে আছি কোনদিন শুনতে পাব ক্লাশ নিলেই এখন হাতে টাকার খাম ধরিয়ে দেয়া হবে। এটাই শুধু বাকী আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের টাকা উপার্জনের সবচেয়ে অসম্মানজনক এবং অনৈতিক পদ্ধতিটি হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা নামক প্রক্রিয়া থেকে টাকা উপার্জন। আমার কথা বিশ্বাস না করলে একবার ভর্তি পরীক্ষার পর একেকজন শিক্ষক কতো টাকা করে উপার্জন করেন তার তালিকাটি এক নজর দেখা উচিৎ। আমি বহুদিন থেকে সাংবাদিকদের বলে আসছি ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কে কোন কাজটুকু করার বিনিময়ে কতোটাকা আয় করেছেন সেটা যেন প্রকাশ করে দেন। এটি একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ তথ্য হতে পারতো, আমার ধারণা আমাদের দেশের সাংবাদিকদের এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে এক ধরণের সম্মানবোধ এবং মমতা আছে তাই এই তথ্যগুলো কখনো প্রকাশ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো এতো বড় সম্মানী মানুষেরা অল্প কিছু টাকা পয়সার জন্যে এতো ধরনের তুচ্ছ কাজ করেন তার কারন একটাই, তাদেরকে খুব অল্প বেতন এবং তার চাইতেও কম সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। পরিবার পরিজন নিয়ে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে সম্ভবত তাদের আর কোনো উপায় নেই। তাই তারা যদি নিজেদের আলাদা বেতন স্কেলের জন্যে মানব বন্ধন করেন, পথে নেমে দাবী দাওয়া পেশ করেন তাহলে তাদের দোষ দেয়া যায় না। আমি মনে করি তাদের দাবীটি খুবই যৌক্তিক, কিন্তু তার

পরও আমি কিন্তু সেই মানব বন্ধনে যোগ দিই নি। কেন যোগ দেই নি সেটি বলার জন্যে আমার এই বিশাল গৌরচন্দ্রিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কম হতে পারে কিন্তু তারা এই দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ভাইস চ্যান্সেলররা এই দেশের মন্ত্রী-প্রধান মন্ত্রীদের সাথে ওঠাবসা করেন। রিটায়ার করার পর তারা নানা দেশের হাই কমিশনার এম্বেসেডর হন। তারা প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হন। রাষ্ট্রের সব বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তারা সদস্য থাকেন। প্রশ্ন ফাঁস হবার পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে লাইনে আনার জন্যে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যে মিটিং ডেকেছিলেন আমি সেখানে বসে ডানে বামে যেদিকেই তাকিয়েছি সেদিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলেরদের দেখেছি। স্কুল কলেজের শিক্ষকদের দেখিনি। সেখানে কথাবার্তা যা বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই বলেছেন, স্কুল কলেজের লেখাপড়ার সমস্যার কথা যখন আলোচনা হয়েছে সেটাও আলোচনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা, যাদের প্রকৃত বাস্তব সমস্যা নিয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। যারা এই দেশের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন সেই স্কুল কলেজের শিক্ষকরা যেন একটা গুরুত্বহীন জনগোষ্ঠী। তাদের কথা কে বলবে? কোথায় বলবে ?

আমি মাঝে মাঝে একেবারে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সাথে কথা বলেছি, তাদের জগৎটি প্রায় পরাবাস্তব জগতের মত। যেভাবে তাদের দিন কাটাতে হয়, ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে হয় সেটি নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে গ্রামে কতোগুলো স্যানিটারী লেট্রিন আছে সেটাও তাদেরকে করতে হয়। তারা কী যথেষ্ট বেতন পান ? সেই বেতন নিয়ে তারা কী সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন ? যদি না পারেন তাহলে তাদের বেতন বাড়ানোর কথা কে বলবে ? কার কাছে বলবে ? তাদের কথা কে শুনবে ?

আমি বিশ্বাস করি তাদের কথাও আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই বলতে হবে, কারন আমরা একেবারে উপরের মহলে কথা বলার সুযোগ পাই, তারা পায় না। তাই আমি যখন হঠাৎ করে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাদের আলাদা একটা বেতন স্কেলের জন্যে মানব বন্ধন করছেন, তখন আমার কেন জানি মনে হয় তারা স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথা বলছেন। দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার নেতৃত্বের দায়টুকু যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঘাড়েই পড়েছে তাদের দাবীটি হওয়া উচিৎ ছিল সকল শিক্ষকদের জন্যে। মানব বন্ধন করা উচিৎ ছিল বাংলাদেশের সকল শিক্ষকদের আলাদা বেতন স্কেলের জন্যে - শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে নয়। সত্যি কথা বলতে কী আলাদা বেতন স্কেল যদি শুরু করতে হয় তাহলে প্রথমে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের দিয়েই শুরু করতে হবে। আমরা যদি আমাদের দেশের শিক্ষার মান বাড়াতে চাই, হাইফাই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে হবে না, ভালো প্রাইমারী স্কুল দিয়েই করতে হবে।

অবশ্যি বলাই বাহুল্য এই পুরো দাবীটা আসলে এক ধরনের নিষ্ঠুর কৌতুকের মত, আমরা সবাই জানি কখনোই এটা হবে না, ক্ষমতাশালী আমলারা গলাটিপে শিক্ষকদের আলাদা বেতন স্কেলের দাবীটাকে শেষ করে দেবেন! শিক্ষক বললে যে মানুষগুলোর ছবি তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই মানুষগুলোর জন্যে তাদের কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই কোনো মমতা নেই। তাদের আলাদা বেতন স্কেল দেওয়ার আগে রাস্তাঘাট তৈরী হবে, ব্রীজ তৈরী হবে, কলকারখানা তৈরী হবে, এয়ারপোর্ট হবে, যুদ্ধ জাহাজ হবে, ক্যান্টনমেন্ট হবে, ফাইটার প্লেন হবে, বন্দর হবে, শুধু শিক্ষকদের বেতনটুকু হবে না, তাদেরকে সম্মানজনক ভাবে বাঁচতে দেয়া হবে না। কেমন করে হবে ? বাংলাদেশ সরকার সারা পৃথিবীর সামনে অঙ্গীকার করেছিল যে এই দেশের জিডিপি এর শতকরা ৬ শতাংশ শিক্ষার পিছনে খরচ করবে। সেই অঙ্গীকার সরকার রাখেনি । এখন জিডিপি এর মাত্র ২.২ শতাংশ শিক্ষার পিছনে খরছ হয়। আর কোনো সভ্য দেশ শিক্ষার পিছনে এতো কম টাকা খরচ করে না! সত্যি কথা বলতে কী এতো কম টাকা খরচ করার পরও আমরা যে কোনো এক ধরনের শিক্ষা পাচ্ছি সেটাই মনে হয় আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য !

বাংলাদেশে যদি শুধুমাত্র একটা দাবী করতে হয় তাহলে সেটি হতে হবে এই বিষয়টি নিয়ে, দরকার হলে সব কিছু বন্ধ করে শিক্ষার জন্যে আরো বেশী অর্থ বরাদ্ধ করতে হবে।

২।

শিক্ষকদের দ্বিতীয় দাবীটি হচ্ছে তাদের চাকরীর বয়সসীমা ৬৭ করে দিতে হবে, আমি এর সরাসরি বিরুদ্ধে। অল্প কিছুদিন আগেও সেটা ছিল ৬০ বৎসর, কীভাবে কীভাবে সেটা জানি ৬৫ করিয়ে নেয়া হল, সেটাতে এখনো অভ্যস্ত হইনি এখন হঠাৎ করে দাবী উঠেছে সেটাকে ৬৭ করতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী অন্য সবাইকে দাবী করে সেটা আদায় করতে হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু স্বায়ত্বশাসিত তাদের কারো কাছ থেকে সেটা আদায় করতে হয় না, নিজেরা নিজেরাই সেটা নিজেদের জন্যে করে ফেলে! যতদূর জানি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সেটা এর মাঝে করেও ফেলেছে, অন্যদের তাহলে দাবী তুলে সেটা আদায় করতে হবে কেন ? নিজেরা নিজেরা করে ফেললেই পারে !
পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে পুরানোদের সরে গিয়ে নতুনদের জায়গা করে দিতে হয়। বুড়ো বুড়ো অধ্যাপকেরা যদি সরতে রাজী না হন, বছরের পর বছর নিজের চেয়ারটা জোর করে আকড়ে ধরে বসে থাকেন তাহলে নতুনেরা কেমন করে দায়িত্ব নেবেন ? যারা চেয়ারটা আকড়ে ধরে রেখেছেন তাদের কয়জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে তারা নিজেদের কাজ কর্ম গবেষনা দিয়ে এই জায়গায় পৌছেছেন ? যারা সত্যিকারের ভালো অধ্যাপক তাদের সাহায্যটুকু নেয়ার জন্যে একশ একটা উপায় বের করা যায়, সেজন্যে

তাদের চাকরীর বয়স ৬৭ করতে হয় না।

যখন শুনতে পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরীর বয়সসীমা ৬৭ করার একটা পায়তারা চলছে, তখন আমার একজন অধ্যাপক বন্ধু আমাকে বিষয়টা বুঝিয়েছিল। সে বলেছিল, "অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক অমুক প্রফেসরের রিটায়ার করার সময় এসেছে, অবসরের বয়স ৬৭ করা না হলে তারা বিদায় হয়ে যাবে, ইউনিভার্সিটির পলিটিক্স আর করতে পারবে না। পলিটিক্সের জন্যে তাদেরকে রাখতেই হবে, সেই জন্যে তাড়াহুড়ো করে চাকরীর বয়স ৬৭ পর্যন্ত ঠেলে দেয়া হয়েছে।" আমার অধ্যাপক বন্ধু আরো ভবিষ্যতবাণী করল, বলল, "অমুক অমুক বিশ্ববিদ্যালয় এখন বয়সসীমা ৬৭ করবে না কারন সেটা করা হলে অমুক অমুক প্রফেসরদের বিদায় করা যাবে না। তারা বিদায় হবার পর এটা ৬৭ করা হবে কারন তখন আর কোনো সমস্যা হবে না। ভাইস চ্যান্সেলরদের বয়স কম তাদের কোনো তাড়াহুড়া নেই !"

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিল পলিটিক্স বুঝি না তাই আমার অধ্যাপক বন্ধুর ভবিষ্যৎ বাণীর মাঝে কতোটুকু যুক্তি এবং কতোটুকু টিটকারী ধরতে পারিনি! ভবিষ্যৎ বাণীটুকু মিলে গেলে বুঝতে পারব, দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছি!

আপাতত আমি বলতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বয়সসীমা ৬৭ অরে ফেলাটুকু হবে নেহায়েত স্বার্থপরের কাজ। শুধু মাত্র নিজেদের জন্যে আলাদা বেতন স্কেল দাবী করে যে স্বার্থপরের কাজ করেছি, নতুন প্রজন্মকে জায়গা করে না দিয়ে, জোর করে চেয়ারটা ধরে রেখে সেই স্বার্থপরতাটুকু ষোল কলায় পূর্ণ করার আমি ঘোরতর বিরোধী।

আমার কথা কাউকে মানতে হবে না, শুনতে দোষ কী ?

ঈদঃ এখন এবং তখন

১.

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন টেলিভিশন বলে কিছু ছিল না তাই ঈদটি ছিল মাত্র একদিনের, সকালে শুরু হয়ে রাতে শেষ হয়ে যেতো। এখন অসংখ্য টেলিভিশন চ্যানেল, মাত্র একদিনের ঈদে তাদের পোষানোর কথা না, তাই ঈদকে টেনে অনেক লম্বা করা হয়েছে। "ঈদের প্রথম দিন" "ঈদের দ্বিতীয় দিন" এভাবে চলতেই থাকে এবং প্রায় সপ্তাহখানেক পরেও আবিষ্কার করি ঈদ উৎসব চলছে! আনন্দকে টেনে লম্বা করার মাঝে দোষের কিছু নেই, কাজেই আমার ধারণা ঈদ উৎসবকে এভাবে সপ্তাহ বা দশ দিন করে ফেলার ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই!

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ঈদের উৎসবকে টেনে লম্বা করার কোনো উপায় ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী দিন শেষ হয়ে অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে আমাদের মনে দুঃখের অন্ধকার নেমে আসতো এবং এতো আনন্দের ঈদটি শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা চিন্তা করে আমরা রীতিমতো হাহাকার করতে থাকতাম। আমার জানামতে ঈদকে একটু লম্বা করে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত টেনে নেয়ার প্রথম চেষ্টা করেছিল আমাদের বড় ভাই, হুমায়ূন আহমেদ। ঈদের অনেক আগেই সে ঘোষণা দিল এখন থেকে ঈদের রাতে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে! কাজেই ঈদের আনন্দটা যে শুধু মাত্র ঈদের রাতে অনেকক্ষন টেনে নেয়া হল তাই নয়, ঈদের অনেক আগে থেকেই বিচিত্রানুষ্ঠানের নাচ গান আবৃত্তি নাটক এসবের রিহার্সেলের মাঝে এই আনন্দ শুরু হয়ে গেল! (টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও ইচ্ছে করলে ঈদ উৎসব "ঈদের আগের রাত", "ঈদের আগের রাতের আগের রাত" সেভাবেও ঠেলে দিতে পারে এবং আমি আমার শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি সেটা বেশ ভালো কাজ করার কথা।) ঈদের রাতে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করার কারণে আমাদের ভাই বোনদের ঈদ উৎসবটি সব সময়েই একটা ভিন্ন মাত্রায় চলে যেতো! অন্যেরা নূতন জামা পরে বাড়ী বাড়ী ঘুরে খেয়ে দেয়ে ঈদ শেষ করে ফেলত, আমরা তার সাথে নাচ গান কবিতা নাটক এইসব যোগ করে সেটাকে আর চমকপ্রদ করে ফেলতাম। কেউ যেন মনে না করে এগুলো শুধু আমাদের পারিবারিক একটা অনুষ্ঠান হতো - মোটেও তা নয়। বাসার বারান্দায় স্টেজ বানিয়ে পর্দা ফেলে রীতিমত হুলুস্থুল কান্ড ঘটিয়ে ফেলা হতো। কোনো রকম প্রচার করা হতো না তারপরও অনুষ্ঠান শুরু করার সাথে সাথে এই এলাকার সবাই দর্শক হিসেবে চলে আসতো এবং তারা ধৈর্য্য ধরে সেই অনুষ্ঠান উপভোগ করতো। বলার অপেক্ষা রাখে না এই সবকিছু পরিচালনা করতো হুমায়ূন আহমেদ - শুধু যে পরিচালনা করতো তা নয় সে খুব সুন্দর অভিনয়ও করতে পারতো।

ঈদের পরদিন আমরা সবাই মন খারাপ করে ঘুম থেকে উঠতাম, তবে সবচেয়ে বেশী মন খারাপ হতো আমাদের বাড়ীওয়ালার ছেলের। অবধারিত ভাবে সব দর্শকেরা মিলে পা দিয়ে মাড়িয়ে ঈদের রাতে তার চমৎকার ফুলের বাগানটা তছনছ করে দিতো! তবে সে জন্যে কখনো এই অনুষ্ঠান বন্ধ থাকেনি।

ঈদ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কিন্তু যখন ছোট ছিলাম তখন কখনোই ধর্মীয় অংশটুকু চোখে পড়েনি - শুধুমাত্র আনন্দ আর উৎসবের অংশটুকু চোখে পড়েছে। তবে মনে আছে, একবার ঈদের নামাজ পড়তে গিয়েছি, নামাজের সময় খোতবা পড়া হচ্ছে, হঠাৎ একজন মানুষের ক্রুদ্ধ গালি গালাজ শুনে তাকিয়ে দেখি ঈদের জামাতের পাশে একজন বিশালদেহী মানুষ, লম্বা দাড়ি, মাথায় টুপি, দীর্ঘ পাঞ্জাবী পরনে আঙ্গুল তুলে আমাদের অভিশাপ দিয়ে বলছে, আমাদের ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ এর কারনে আমরা সবাই জাহান্নামে যাব! আমি রীতিমত আঁতকে উঠেছিলাম, বড়দের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ঈদের চাঁদ উঠেছে কী উঠেনি সেটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হচ্ছে এবং মানুষ দুইভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একভাগ আজকে ঈদ করছে, অন্যভাগ আগামী কাল। এই বিশাল দেহী মানুষটি আগামী কাল ঈদ করার দলে, তার ধারণা একদিন আগে ঈদ করে আমরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি এবং তাই আমাদের রক্ষা করার জন্যে শেষ চেষ্ঠা করতে এসেছে!

যাই হোক ঈদের জামাতে যারা ছিল তারা ব্যাপারটাকে সহজভাবেই নিল, তাই কোনো গোলমাল হল না। কিন্তু মাঝে মাঝেই গোলমাল লেগে যেতো। এখন চাঁদ দেখার কমিটি হয়, তারা সবাই মিলে একটা ঘোষনা দেয়, তাই আগের মত কোনদিন ঈদ হবে সেটা নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি থাকে না। তবে মজার ব্যাপার হল তারপরও প্রতি বছর দেখি আমাদের দেশের কোথাও কোথাও ঈদ উদযাপন করা হয় সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে - ব্যাপারটা কেন ঘটে এখনো আমি বুঝতে পারিনি। এখানে বলে রাখা ভালো চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে কিভাবে ঘুরছে সেটি এখন এতো সূক্ষ্মভাবে জানা সম্ভব যে কেউ আকাশের দিকে না তাকিয়েই বলে দিতে পারবে চাঁদটি আকাশের কোন জায়গায় কোন অবস্থায় আছে! (স্বীকার করছি এ কারণে ঈদের চাঁদ খুঁজে বের করার পুরো আনন্দটি মাটি হয়ে যাবার আশংকা আছে।)

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেশের মানুষের কাপড় জামা খুব বেশী ছিল না। বেশীরভাগ মানুষ বছরে একবারই নূতন জামা কাপড় কিনতো - আর সেটা হতো ঈদের সময়। প্রতি ঈদে আমরা নূতন জামা কাপড় পেতাম তাও নয় - কোনো কোনো ঈদে কেউ কেউ পেতো - তাতেই আমরা মহাখুশী ছিলাম। একবার ঈদে আমাকে জুতো কিনে দেয়া হল, ঈদের আগে সেই জুতো পরা ঠিক হবে না কিন্তু পায়ে দিয়ে দেখারও ইচ্ছে করে। জুতো পায়ে দিয়ে হাটাহাটি করলে ময়লা হয়ে যাবে তাই সেই জুতো পরে আমি বিছানায় হাঁটাহাটি করি! মজার ব্যাপার হচ্ছে সেটা দেখে কেউ অবাকও হয় না।

তখন লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডারের কালজয়ী বইগুলো আমরা পড়ছি, বাংলায় অনুবাদ করেছেন জাহানারা ইমাম, আমাদের সবার প্রিয় বই "ঘাসের বনে ছোট্ট কুটির"। (আমাদের শৈশবের এই প্রিয় বইগুলো যে জাহানারা ইমাম অনুবাদ করেছিল সেটি আমি জেনেছি বড় হয়ে জাহানারা ইমাম মারা যাবার পর। এটা নিয়ে আমার ভেতরে খুব একটা আফসোস রয়ে গেছে, জাহানারা ইমাম আমার খুব প্রিয় মানুষ, আমেরিকা থাকার সময় তার খুব কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, কতো কিছু নিয়ে গল্প করেছি কিন্তু তাকে কখনো ধন্যবাদ দিতে পারিনি এই অসাধারণ বইগুলো অনুবাদ করার জন্যে।) যাই হোক ঘাসের বনে ছোট্ট কুটির পড়ে আমরা জানতে পারলাম ক্রিসমাসে শুধু যে নূতন কাপড় উপহার দেয়া যায় তা নয় – অন্য কিছুও উপহার দেওয়া যায়। তাই একবার আমরা সব ভাই বোনেরা মিলে ঠিক করলাম ঈদে আমরা নূতন কাপড় পাই আর না পাই আমরা নিজেরাই একে অন্যকে উপহার দিব! অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে ছোট ছোট উপহার দিয়ে ঈদের দিনে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলাম। সেই ছোট বেলায় আবিষ্কার করেছিলাম উপহার পাওয়ার থেকেও অনেক বেশী আনন্দ উপহার দেওয়াতে! যারা আমার কথা বিশ্বাস করে না তারা ইচ্ছে করলেই ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে পারে!

তারপর দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেলাম, এক সময় আবিষ্কার করেছি যে আমি দেশের বাইরে। আমার ছোট ছোট দুটি ছেলে মেয়ে আমেরিকার মাটিতে তাদের হাজার রকম আনন্দ কিন্তু ঈদ ব্যাপারটি তারা সত্যিকার ভাবে কখনো দেখেনি! আমার ছেলে মেয়ে সত্যিকার অর্থে প্রথম ঈদ দেখেছে আমরা দেশে ফিরে আসার পর। আঠারো বছর আগে যখন দেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম তখন সবাই মিলে শুধু মাত্র টিকে থাকার সংগ্রাম করছি। যখন ফিরে এলাম তখন মোটামুটি ভাবে সবাই দাড়িয়ে গেছে। বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ ততদিনে "হুমায়ূন আহমেদ" হয়ে গেছে। সেই শৈশবে সে যেরকম আমাদের ভাই বোনদের নিয়ে ঈদের আনন্দ করতো এখন সে আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে সেই আনন্দ করে! আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন "সেলামী" বলে কিছু ছিল না, ফিরে এসে দেখি "সেলামী" কালচার শুরু হয়ে গেছে। সালাম করলেই টাকা! বড় ভাই একটা নিয়ম করে দিয়েছে, যার যত বয়স তার দ্বিগুন টাকা সেলামী দেওয়া হবে! একবার আমার বোনের মেয়ে ঈদে ঢাকা নেই, তার বয়স সাত। কাজেই ঈদের সেলামী হিসেবে তাকে মানি অর্ডার করে সাত দ্বিগুনে চৌদ্দ টাকা পাঠিয়ে দিল। পিয়ন সেই টাকা পৌছে দিতে গিয়ে খুবই অবাক – একজন মানুষ কেমন করে এতো যন্ত্রণা করে মানি অর্ডারে মাত্র চৌদ্দ টাকা পাঠায়? কেন পাঠায়?

আমরা তখন বড় হয়ে গেছি, আমাদের পরের প্রজন্ম ছোট ছোট শিশু, ঈদের দিনে এখন তাদের দেখে আমরা আনন্দ পাই। ভাই বোন সবারই বেশীর ভাগই মেয়ে, ঈদের আনন্দ তাদের মনে হয় একটু বেশী। ঈদের আগের রাতে সবাই মিলে হাতে মেহেদী দেয় – আমাদের পরিবারের প্রায় সবাই ছবি আকঁতে পারে কাজেই হাতে মেহেদী দেয়া যে রীতিমত শিল্পকর্ম হয়ে যাবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। হাতে মেহেদী দিয়ে সেই মেহেদী হাতে নিয়ে রাতে ঘুমাতে যায়, ভোরবেলা দেখা হয় কার মেহেদীর রং কতো তীব্র হয়েছে! সেটা দেখেই তাদের আনন্দ।

ঈদের সারাটি দিন সবাই নানা কাজে ব্যস্ত, রাত্রি বেলা সবাই আমার মায়ের কাছে হাজির হই। হৈ হুল্লোর করে সময় কাটে। বাসায় ফিরে যাবার আগে হুমায়ূন আহমেদ পকেট থেকে এক হাজার টাকা বের করে টেবিলে রেখে বলে এখন লটারী করে দেখা যাবে কে টাকাটা পায়। ছোট ছোট কাগজে সবার নাম লেখা হয়, কাজে সাহায্য করার মানুষ, গাড়ীর ড্রাইভার কেউ বাকী থাকে না। তারপর একটি একটি করে সেই কাগজের টুকরো গুলো তোলা হয়, শেষ পর্যন্ত যার নামটা থেকে যায় সেই হচ্ছে বিজয়ী! এরকম উত্তেজনার লটারী আমার জন্মে খুব বেশী দেখিনি ! এরপর আরো অনেক দিন কেটে গেছে, যারা ছোট ছোট শিশু ছিল তারাও বড় হয়ে যাচ্ছে! কারো কারো বিয়ে হয়েছে – তাদের বাচ্চারা এখন ঈদের আনন্দ করে আর আমরা তাকিয়ে দেখি!

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন লেখালেখি বা সাহিত্যের পুরো বিষয়টি ছিল কলকাতা কেন্দ্রীক। পূজার সময় শারদীয় সংখ্যা বের হতো আর আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতাম। বলা যেতে পারে আমাদের চোখের সামনে "ঈদ সংখ্যা" নামে বিষয়টি শুরু হয়েছে এবং আজকাল সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে ঈদ সংখ্যার জন্যে অপেক্ষা করেন। আমরা যারা অল্পবিস্তর লেখালেখি করে একটু পরিচিতি পেয়েছি, ঈদের আগে আমাদের ঈদ সংখ্যায় লেখার জন্যে চাপ আসতে থাকে, পুরোটা যে সাহিত্যের জন্যে ভালোবাসার কারনে তা নয়, এর মাঝে বাণিজ্যের অংশটা প্রবল বলে আজকাল উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। টেলিভিশনে ঈদের ফাঁকে ফাঁকে যেরকম বিজ্ঞাপন দেখানো হয় ঈদ সংখ্যার লেখায় ফাঁকে ফাঁকেও যে বিজ্ঞাপন থাকে সেটা কী সবাই লক্ষ্য করেছে ? ছেলে বেলায় ঈদের আগে যত্ন করে নিজের হাতে অনেক ঈদ কার্ড তৈরী করেছি, বেশীর ভাগই ছোট বাচ্চাদের দেয়ার জন্যে! তারাও আমাকে ঈদ কার্ড তৈরী করে দিয়েছে। আমার মনে হয় নিজের হাতে তৈরী করা ঈদ কার্ড পাওয়ার অনন্দ খুব বেশী মানুষের হয়নি, সেই হিসেবে আমি খুব সৌভাগ্যবান। এই দেশের ছোট ছোট বাচ্চারা এখনো নিয়মিত ভাবে নিজের হাতে ঈদ কার্ড তৈরী করে আমাকে পাঠায় ! তবে যে বিষয়টি আগে একেবারেই ছিল না এখন প্রবল ভাবে হয়েছে সেটি হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে পাঠানো এস.এম.এস ! অন্যদের কথা জানি না, আমার "ঈদ এস.এম.এস" পড়ে শেষ করতে কয়েকদিন লেগে যায় !

২.

এই লেখাটি যখন ছাপা হবে তখন ঈদ সবে মাত্র শেষ হয়েছে তাই সবার জন্যে রইল ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদের শুভেচ্ছা কথাটি লিখতে গিয়েও আমি থমকে দাড়িয়েছি, আমি কী সবাইকে এই শুভেচ্ছাটি দিতে পারব? প্রতিদিন খবরের কাগজে অবরুদ্ধ গাজার স্বজন হারা ফুটফুটে শিশুদের আতংকিত ছবি ছাপা হচ্ছে (যখন এটি লিখছি তখন এক হাজারের বেশী মানুষকে ইজরায়েলী সৈন্যরা হত্যা করে ফেলেছে) আমি যদি সেই শিশুদের ঈদের শুভেচ্ছা জানাই তাহলে তারা কী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে না ? তাদের চোখের সেই নীরব অভিশাপ থেকে নির্বিকার পৃথিবীর নির্বিকার মানুষ কখনো কী মুক্তি পাবে ?

একটি অসাধারণ আত্মজীবনী

১.

মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় আমাদের কতো বড় সৌভাগ্য যে বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর মত একজন মানুষের জন্ম হয়েছিল। ঠিক যেই সময়টিতে দরকার হয়েছিল তখন যদি তাঁর মত একজন মানুষের জন্ম না হতো তাহলে কী হতো ? তাহলে কি বাঙালীরা নিজের একটা দেশের স্বপ্ন দেখতে পারতো ? সেই দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে পারতো ? অকাতরে প্রাণ দিতে পারতো ? যদি আমরা নিজের একটি দেশ না পেতাম, এখনো পাকিস্তান নামের সেই বিদঘুটে দেশটির অংশ হিসেবে থাকতাম তাহলে আমাদের কী হতো সেই কথা চিন্তা করে আমি আতংকে শিউরে শিউরে উঠি।

এই মানুষটিকে পচাত্তরে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক মহামানবকে নিজের দেশ কিংবা দেশের মানুষের জন্যে প্রাণ দিতে হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিষয়টি ছিল অবিশ্বাস্য। তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেই হত্যাকারীরা দায়িত্ব শেষ করেনি, এই দেশের ইতিহাস থেকে তার চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্যে একুশটি বছর এমন কোনো কাজ নেই যেটি করা হয়নি। যে মানুষটির কারণে আমরা আমাদের দেশটি পেয়েছি সেই দেশের রেডিও টেলিভিশনে কোনোদিন তার নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। আমার মনে আছে প্রথমবার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, "চলো আমরা একটা টেলিভিশন কিনে আনি, এখন নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুকে টেলিভিশনে দেখাবে!" শুধুমাত্র তাকে দেখার জন্যে আমরা একটা টেলিভিশন কিনে এনেছিলাম!

আমরা আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশকে জন্ম নিতে দেখেছি, আমরা এই দেশের ইতিহাসের সাক্ষী, ইতিহাসের অংশ। আমাদের চোখের সামনে বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। শৈশব কৈশোরে তাঁর সবকিছুর গুরুত্ব সবসময় বুঝতে পারিনি, এখন বড় হয়ে যখন পিছনে ফিরে তাকাই কখনো বিস্মিত হই, কখনো রোমাঞ্চিত হই, কখনো হতচকিত হয়ে যাই। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে একজন মানুষ হিসেবে অনুভব করার অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে ২০১২ সালে, যখন তার নিজের হাতে লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" বইটি হাতে পেয়েছি। আমি যখন নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মজীবনীটি পড়ছিলাম তখন আমার বার বার মনে হয়েছিল, বছরের হিসেবে আমাদের বঙ্গবন্ধু তো নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে খুব একটা কম সময় জেলে ছিলেন না, অবদান হিসেবে তাঁর অবদান তো নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে খুব একটা কম নয়, তাহলে তিনি কেন তাঁর মতো করে নিজের আত্মজীবনী লিখে গেলেন না - আমরা কেন সেটি পড়ে রোমাঞ্চিত হবার সুযোগ পেলাম না। তাই শেষ পর্যন্ত যখন বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা আবিষ্কৃত হল, সেটি প্রকাশিত হল, আমার আনন্দের সীমা ছিল না।

শিশু কিশোরেরা যেভাবে রুদ্ধশ্বাসে ডিটেকটিভ বই পড়ে আমি ঠিক সেভাবে রুদ্ধশ্বাসে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীটি পড়েছি। আমি মনে করি এই বইটি আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। যারা দেশকে ভালোবাসে তাদের সবাইকে এই বইটি পড়তে হবে। যারা দেশের ইতিহাস জানতে চায় তাদেরকে এই বই পড়তে হবে। যারা রাজনীতি করে তাদেরকে এই বই পড়তে হবে। যারা রাজনীতি করতে চায় তাদেরকে এই বই পড়তে হবে। যারা দেশ শাসন করে তাদেরকে এই বই পড়তে হবে, যারা দেশ শাসন করতে চায় তাদেরকেও এই বই পড়তে হবে। এই বইটি পড়লেই শুধুমাত্র একজন মানুষ বুঝতে পারবে কীভাবে একজন মানুষ একটি জাতি হয়ে উঠে, একটি জাতি কীভাবে দেশ হয়ে উঠে।

২.

বইটিতে অসংখ্য বিষয় আছে - যেমন ধরা যাক বাঙালিদের কথা। তিনি বাঙালিদের কীভাবে দেখেছেন ? বইয়ের অনেক জায়গায় তাদের কথা বলা আছে আমার পছন্দের একটা অংশ যখন তাদেরকে পাকিস্তানিদের সাথে তুলনা করেছেন (পৃষ্ঠা ২১৪) “প্রকৃতির সাথে মানুষের মনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। বালুর দেশের মানুষের মনও বালুর মতো উড়ে বেড়ায়। আর পলিমাটির বাংলার মানুষের মন ঐ রকমই নরম, ঐ রকমই সবুজ। প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যে আমাদের জন্ম, সৌন্দর্যই আমরা ভালবাসি।” বাঙালির চরিত্রের নিখুত ব্যাখ্যাও করেছেন অন্য জায়গায় (পৃষ্ঠা ৪৭) “আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হল আমরা মুসলমান, আর একটা হল আমরা বাঙালি। পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোন ভাষাতেই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, ‘পরশ্রীকাতরতা’। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে ‘পরশ্রীকাতর’ বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষাতেই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশী হয়না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুন থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ... যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।” বাঙালিদের নিয়ে এর চাইতে খাটি মূল্যায়ন আমার চোখে আর কখনো পড়েনি!

এই বাঙালিদের জন্যে তার বুকে ছিল গভীর ভালোবাসা। নির্বাচনের সময় একবার হেঁটে হেঁটে প্রচারণার কাজ চালাচ্ছেন তখন এক হতদরিদ্র বৃদ্ধা মহিলার সাথে দেখা। বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্যে কয়েক ঘন্টা থেকে দাড়িয়ে আছে, তাকে ধরে নিজের কুড়েঘরে নিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান আর চার আনা পয়সা দিয়েছে, বলেছে, “খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা নেও, আমার তো কিছু নাই।” বঙ্গবন্ধু সেই পয়সা না নিয়ে উল্টা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন, লাভ হয়নি। সেই হতদরিদ্র মহিলার বাড়ী থেকে বের হবার পর, বঙ্গবন্ধু লিখছেন (পৃষ্ঠা ২৫৬) “নীরবে আমার চক্ষু দিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিলো, যখন তার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি। সেইদিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মানুষরে ধোঁকা

আমি দিতে পারব না।” আমরা সবাই জানি বঙ্গবন্ধু তার এই প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ করেন নি।

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ এই পুরো বইটার একটা বড় অংশ হচ্ছে কীভাবে বঙ্গবন্ধু মুসলিম লিগের গুন্ডা আর পুলিশের নির্যাতন সহ্য করেছেন, জেল খাটছেন। পাকিস্তানের জন্যে আন্দোলন করেছেন কিন্তু দেশ বিভাগের পরপরই খুবই দ্রুত মুসলিম লীগের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছেন আর এই মুসলিম লীগ সরকার তার উপর নির্যাতন করছে, বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেল খানায় আটকে রাখছে। এক জায়গায় বর্ণনা আছে মাওলানা ভাষানীকে নিয়ে শোভাযাত্রা করছেন তখন পুলিশ আক্রমন করেছে। বঙ্গবন্ধু লিখছেন (পৃষ্ঠা ১৩২) “আমার উপরও অনেক আঘাত পড়ল। একসময় প্রায় বেহুঁশ হয়ে একপাশের নর্দমায় পড়ে গেলাম। ... আমার পা দিয়ে খুব রক্ত পড়ছিল। কেউ বলে গুলি লেগেছে, কেউ বলে গ্যাসের ডাইরেক্ট আঘাত, কেউ বলে কেটে গেছে পড়ে যেয়ে।” তারপর কীভাবে তাকে ধরাধরি করে পার্টির অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো তার বর্ণনা আছে। সেখানে একটু চিকিৎসা করে বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন বলে ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হল। কিন্তু গভীর রাতে পুলিশ এলো তাদের গ্রেফতার করতে। মাওলানা ভাসানী খবর দিয়েছিলেন যেন কোনভাবে গ্রেফতার না হন তাই লিখছেন, “আমার শরীরে ভীষন বেদনা, জ্বর উঠেছে, নড়তে পারছি না। কি করি, তবুও উঠতে হল এবং কি করে ভাগব তাই ভাবছিলাম। ... তিনতলায় আমরা থাকি, পাশেই একটা দোতলা বাড়ি ছিল। তিনতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে পড়তে হবে। দুই দালানের ভিতর ফারাকও আছে। নিচে পড়লে শেষ হয়ে যাব। তবুও লাফ দিয়ে পড়লাম।” আমরা হলিউডের ছবিতে এরকম দৃশ্য দেখে অবিশ্বাসের হাসি হেসে থাকি - কিন্তু এটা হলিউডের ছবি নয়; বঙ্গবন্ধুর নিজের জীবনের ঘটনা, নিজের হাতে লেখা।

একবার পাকিস্তান থেকে দিল্লী হয়ে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় ফিরে আসছেন, তিনি জানেন তাকে গ্রেফতার করা হবে, তিনিও প্রস্তুত আছেন, তার ভাষায় (পৃষ্ঠা ১৪৫) “আমিও প্রস্তুত আছি, তবে ধরা পড়ার পূর্বে একবার বাবা-মা, ভাইবোন, ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা করতে চাই।” কারণ (পৃষ্ঠা ১৪৬) “কয়েক মাস পূর্বে আমার বড় ছেলে কামালের জন্ম হয়েছে, ভাল করে দেখতেও পারি নাই ওকে। হাচিনা তো আমাকে পেলে ছাড়তেই চায় না।” (এই বইয়ে শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধু সবসময় হাচিনা লিখেছেন) এরপর পুলিশের চোখে ধূলা দেয়ার জন্যে ট্রেনে, ষ্টেশনে কি করেছেন তার চমকপ্রদ বর্ণনা আছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় (পৃষ্ঠা ১৪৬) “সকল যাত্রী নেমে যাওয়ার পরে আমার পাঞ্জাবি খুলে বিছানার মধ্যে দিয়ে দিলাম। লুঙ্গি পরা ছিল, লুঙ্গিটা একটু উপরে উঠিয়ে বেঁধে নিলাম। বিছানাটা ঘাড়ে, আর সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম। কুলিদের মত ছুটতে লাগলাম, জাহাজ ঘাটের দিকে। গোয়েন্দা বিভাগের লোক তো আছেই। চিনতে পারল না।” বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ি পৌছাতে পেরেছিলেন, অল্প কিছুদিন স্ত্রী পুত্র কন্যার সাথে কাটাতে পেরেছিলেন। যখন যাবার সময় হয়েছে তখন লিখছেন (পৃষ্ঠা ১৬৪) “ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং

সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে।" বঙ্গবন্ধু যখন এই বাক্যটি লিখেছিলেন তখন কী তিনি জানতেন তাঁর জন্যে একদিন এটি কত বড় একটি সত্য হয়ে দাড়াবে!

জেলখানায় থাকতে থাকতে তাঁর ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, অনেক কষ্টে একবার ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে সকালবেলা বিছানায় বসে স্ত্রীর সাথে গল্প করছেন, তার ছেলেমেয়ে নিচে বসে খেলছে। বঙ্গবন্ধু লিখছেন (পৃষ্ঠা ২০৯) "হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা', 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' " বঙ্গবন্ধু তখন বিছানা থেকে নেমে ছেলেকে কোলে নিয়ে বললেন, "আমি তো তোমারও আব্বা।" তাঁর ছেলে তাকে চেনে না, তাই কাছে আসতে চাইত না। এই প্রথমবার বাবার গলা ধরে পড়ে রইল। লেখক সাহিত্যিকেরা বানিয়ে বানিয়ে কত কী লিখে পাঠকদের মন দুর্বল করে ফেলে, কিন্তু এ রকম সত্যি ঘটনা কি তারা লিখতে পারবে?

ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু জেলে, দুই বছর থেকে বেশি সময় বিনা বিচারে জেলে আটকা পড়ে আছেন, তখন ঠিক করলেন মুক্তির জন্যে আমরণ অনশন করবেন। খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে এবং তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীকে ফরিদপুর জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। অনশন শুরু করার দুইদিনের ভেতর খুব শরীর খারাপ হলে তাদের হাসপাতালে পাঠানো হল। চারদিন পর তাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। বঙ্গবন্ধুর নাকে ঘা হয়ে গেছে, রক্ত আসে যন্ত্রণায় ছটফট করেন। যখন বুঝতে পারলেন আর বেশিদিন বাঁচবেন না, গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনিয়ে বাবা, স্ত্রী এবং তাঁর দুই রাজনৈতিক নেতা সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানিকে চিঠি লিখলেন, কারণ তখন বুঝে গেছেন কয়েকদিন পর আর লেখার শক্তি থাকবে না।

বঙ্গবন্ধু অনশনে কীভাবে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। চিঠি চারটি ঠিক জায়গায় পৌছানোর ব্যবস্থা করেছেন। লিখছেন (পৃষ্ঠা ২০৪) "আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে কোনো মূহুর্তে মৃত্যুর শান্তি ছায়ায় চিরদিনের জন্যে স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম আমার দিন ফুরিয়ে গেছে।... ডেপুটি জেলর সাহেব বললেন, 'কাউকে খবর দিতে হবে কি না ? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন ?' বললাম, 'দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।' আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল।...." এভাবে আরও দুদিন কেটে গিয়েছে। বঙ্গবন্ধু লিখছেন (পৃষ্ঠা ২০৫), "২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি।...."

বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিছু শেষ পর্যন্ত অনশনে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি, এই জীবন-বাজি ধরা আন্দোলনের কাছে সরকার মাথা নত করে তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

পুরো বইটিতে এরকম অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা আছে। কীভাবে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে একটা রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছেন তার নিখুঁত বর্ণনা আছে। ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, বাধা বিপত্তি, ভয়ংকর অর্থকষ্ট, পুলিশের নির্যাতন, বিশ্বাসঘাতকতা সবকিছুকে সামাল দিয়ে কীভাবে একটা রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে হয় সেটি এর চাইতে সুন্দর করে আর কোনো বইয়ে লেখা আছে বলে আমার জানা নেই। মাঝে মাঝে যে হাস্যরস বা কৌতুক নেই তা নয়। রাতের বেলা নৌকা করে যাচ্ছেন, বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে আছেন, তখন ডাকাত পড়েছে। এলাকার সবাই বঙ্গবন্ধুকে চেনে, তাঁকে ভালোবাসে, ডাকাতেরা যখন জানতে পারল নৌকায় বঙ্গবন্ধু শুয়ে আছেন তারা ডাকাতী না করেই মাঝিকে এক ঘা দিয়ে বলল, “শালা, আগে বলতে পার নাই শেখ সাহেব নৌকায়”। ঘুম থেকে উঠে ঘটনাটা শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, (পৃষ্ঠা ১২৫) “বোধ হয় ডাকাতরা আমাকে ওদের দলের একজন বলে ধরে নিয়েছে !”

আরেকবার জনসভায় মাওলানা ভাসানিকে নিয়ে বক্তৃতা করতে গিয়েছেন, পুলিশ তখন ১৪৪ ধারা জারি করে দিয়েছে, কেউ আর বক্তৃতা করতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু তেজস্বী মানুষ, বললেন (পৃষ্ঠা ১২৮) “মানি না ১৪৪ ধারা, আমি বক্তৃতা করব।” মাওলানা সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন– “১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। আমাদের সভা করতে দেবে না। আমি বক্তৃতা করতে চাই না, তবে আসুন আপনারা মোনাজাত করুন, আল্লাহ আমিন।” মাওলানা সাহেব মোনাজাত শুরু করলেন। মাইক্রোফোন সামনেই আছে। আধঘণ্টা চিৎকার করে মোনাজাত করলেন, কিছুই বাকি রাখলেন না, যা বলার সবই বলে ফেললেন। পুলিশ অফিসার ও সেপাইরা হাত তুলে মোনাজাত করতে লাগল। আধা ঘণ্টা মোনাজাতে পুরা বক্তৃতা করে মাওলানা সাহেব সভা শেষ করলেন। পুলিশ ও মুসলিম লীগওয়ালারা বেয়াকুফ হয়ে গেল!” পুরো দৃশ্যটা কল্পনা করে এতোদিন পরেও আমরা হেসে কুটি কুটি হই।

৩.

এই অসাধারণ বইটি সম্পর্কে লিখে শেষ করার কোনো সুযোগ নেই। তারপরও আমি বই থেকে নানা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর কিছু কথা তুলে দিই। যেহেতু তিনি আপাদমস্তক রাজনীতিবিদ, তাই তার রাজনীতি নিয়ে কথাগুলো সবচেয়ে সুন্দর। রাজনীতিটা কখনও দলবাজি হিসেবে দেখেননি। লিখেছেন (পৃষ্ঠা ২৩৯) “ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণাপত্র না থাকলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।” আমলাতন্ত্র দুই চোখে দেখতে পারতেন না, তাই বলেছেন (পৃষ্ঠা ২৩৫) “রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।”

আবার একই সাথে অযোগ্য রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে এভাবে সতর্ক করেছেন (পৃষ্ঠা ২৭৩) ‘‘অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই।’’ বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে বলেছেন, (পৃষ্ঠা ২৩৪) ‘‘আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না।’’ আমাদের দেশে বামপন্থী রাজনীতি কেন কখনও বেশি সুবিধে করতে পারেনি বঙ্গবন্ধু সেটি অর্ধশত বছরেরও আগে বিশ্লেষণ করেছেন।

তাঁর বামপন্থী বন্ধুদের উল্লেখ করে বলেছেন, (পৃষ্ঠা ১০৯) ‘‘জনসাধারণ চলছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত।’’

অতি প্রগতিবাদীদের সম্পর্কেও তাঁর কথাটা তখনও সত্যি ছিল এখনও সত্যি! বঙ্গবন্ধু বলেছেন (পৃষ্ঠা ২৪৫) ‘‘অতি প্রগতিবাদীদের কথা আলাদা। তারা মুখে চায় ঐক্য। কিন্তু দেশের জাতীয় নেতাদের জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে, চেষ্টা করে সেজন্যে !’’

তবে বঙ্গবন্ধুর কাছে রাজনীতির বিষয়টি ছিল খুবই স্পষ্ট, সেটি ছিল একটা মহৎ কাজ। বার বার বলেছেন (পৃষ্ঠা ১২৮) ‘‘যে কোনো মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা জীবনে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোনো ভাল কাজ করতে পারে নাই।’’ রাজনীতি করে তাঁর জীবনে এক ধরনের পূর্ণতা এসেছিল, কারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পুরোপুরি ধরাশায়ী করে লিখছেন (পৃষ্ঠা ২৫৭) ‘‘আমার ধারণা হয়েছিল মানুষকে ভালবাসলে মানুষও ভালবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্যে জীবন দিতেও পারে।’’ বঙ্গবন্ধু মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলেন, একবার নয় বারবার।

৪.

এই লেখার শুরুতে আমি বলেছিলাম ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বইটি সবার পড়া উচিত - যারা দেশ চালাচ্ছে তাদেরও। আমার কেন জানি মনে হয় যারা দেশ চালাচ্ছেন তাদের সবাই এই বইটি পড়েননি - কিংবা তার চাইতেও দুঃখের ব্যাপার হয়তো বইটি পড়েছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো বিশ্বাস করেননি। আমার এরকম মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে এই বইয়ে সবচেয়ে বেশীবার যে কথাটি লেখা হয়েছে সেটি হচ্ছে (পৃষ্ঠা

১২৬) “শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।” কিংবা (পৃষ্ঠা ১২০) “বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে।”

শক্তিশালী বিরোধী দল দূরে থাকুক আমরা কি এই দেশে কোনো বিরোধী দল দেখতে পাচ্ছি? দেশে আসলে কোনো বিরোধী দল নেই, একটা গৃহপালিত বিরোধী দল আছে, তাদের থাকা না থাকাতে কিছু আসে যায় না। জামায়াতে ইসলামীর সাথে রাজনীতি করে এবং বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করে বলে আমি মনে করি এই দেশে বিএনপির রাজনীতি করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। এখন বাকি আছে সংবাদমাধ্যম, যতই দিন যাচ্ছে আমরা দেখছি সংবাদমাধ্যমকে কেমন জানি গলা টিপে ধরা হচ্ছে। মন্ত্রীরা কারণে অকারণে আজকাল সাংবাদিকদের গালাগাল করেন, ভয়ভীতি দেখান। গণজাগরণ মঞ্চ যখন আওয়ামী লীগের সমালোচনা করল তখন তাদেরকেও দুই টুকরো করে দেওয়া হল। পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে আমি যখন চেঁচামেচি করছিলাম তখন আমাকে নানাভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছিল আমি যেন সরকারকে বিপদে না ফেলি।

বঙ্গবন্ধু বারবার বলেছেন সরকারকে ঠিক রাখতে হলে একটা শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার। আমি এই দেশে তাই একটা বিরোধী দল খুঁজে বেড়াই। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের একটা বিরোধী দল।

সেটি কোথায় ?

একটি দুঃখের গল্প

১.

মোবারক সাহেব একটা শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্বে আছেন। অনেকদিন পর আজকে তার ভিতরে এক ধরণের আত্মতৃপ্তির বোধ কাজ করছে। তিনি সময়মতো তার বোর্ডের ফলাফল প্রকাশ করতে পেরেছেন। বাংলাদেশের মত দেশে এটি খুব সহজ কাজ নয় - বাইরের মানুষ কখনও জানতে পারবে না সবকিছু ঠিক ঠিক ভাবে শেষ করতে সবাই মিলে কতো পরিশ্রম করতে হয়।

তার বোর্ডে পাশের হার অন্য বোর্ড থেকে কম। তাতে অবশ্যি অবাক হবার কিছু নেই, ফলাফল প্রকাশ করার আগেই তিনি সেটা জানতেন। এখানে অনেক গরীব মানুষ, বাবা মা লেখাপড়া জানে না, লেখাপড়ার গুরুত্ব বুঝে না। মাঝখানে বন্যায় বইপত্র সহ সবকিছু ভেসে গেল। হরতালে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ইংরেজী প্রশ্নটাও মনে হয় একটু বেশি কঠিন হয়েছিল। সবকিছু মিলিয়ে পাশের হার একটু কম হতেই পারে। আস্তে আস্তে পাশের হার বাড়বে, দেশ এগিয়ে যাবে। দেশের এত বড় একটা কাজে সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছেন তাতেই মোবারক সাহেব খুশি।

কয়েকদিন পর মোবারক সাহেবকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ডেকে পাঠানো হল, কি জন্যে ডাকা হয়েছে সেটা অনুমান করতে পারলেন না। খারাপ কিছু হওয়ার কোনো কারণ নেই তারপরও তার ভেতরটা কেন জানি খচখচ করতে লাগল। সারারাত জার্নি করে সকালে ঢাকা পৌঁছেছেন। ঢাকায় ছোট শালীর বাসায় উঠেছেন সবাই তার খুব যত্ন করল তবুও তার ভেতরে কেমন যেন অশান্তি খচ খচ করতে লাগল। মন্ত্রণালয়ে আগে সবাই তাকে খুব সমাদর করত এবারে কেমন যেন সবাই দূরে দূরে থাকল। তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। শেষে একজন তাকে ডেকে পাঠাল, বয়স মোবারক সাহেব থেকে অনেক কম কিন্তু এই সরকার আসার পর প্রমোশনের পর প্রমোশন পেয়ে ধাঁই ধাঁই করে উপরে উঠে গেছেন। মোবারক সাহেব বসার আগেই মানুষটি খেঁকিয়ে উঠল, "আপনি এইটা কী করেছেন ?"

মোবারক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "কী করেছি ?"

"আপনার বোর্ডে সব ছাত্রদেরকে ফেল করিয়ে রেখেছেন, ব্যাপারটা কি ? ছাত্র-ছাত্রীরা কী ফেল করার জন্য লেখাপড়া করতে আসে ? পেয়েছেন কী আপনি ?"

মোবারক সাহেব এত অবাক হলেন যে অপমানিত বোধ করার সময় পেলেন না। সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন একটা ছাত্র কখন পাশ করে কখন ফেল করে সেটা তার থেকে ভাল করে কেউ জানে না। একজন ছাত্রকে শিক্ষক কখনো পাশ করান না কখনো ফেলও করান না। ছাত্র নিজে পাশ করে না হয় ফেল করে।

মোবারক সাহেবের সামনে বসে থাকা কম বয়সী উদ্ধত বড় কর্তা রীতিমত হুংকার দিয়ে বলল, " আপনার কতো বড় সাহস আপনি এই সরকারকে অপদস্ত করার চেষ্টা করছেন? আপনি দেখানোর চেষ্টা করছেন এই সরকারের আমলে লেখাপড়া হয় না। অন্য সব বোর্ডে পাশের হার বেড়ে যাচ্ছে আর আপনি আপনার বোর্ডে সবাইকে ফেল করিয়ে দিচ্ছেন ? আপনি জানেন না এই সরকার শত ভাগ পাশ করানোর টার্গেট নিয়েছে ? আপনার মতো মানুষের কারণে আমাদের মুখে চুন কালি পড়ছে? নিশ্চয়ই আপনি রাজাকারদের দলে - "

মোবারক সাহেব থ হয়ে বসে রইলেন, একটা কথাও বলতে পারলেন না। মাথা নিচু করে অফিস থেকে বের হয়ে এলেন।

বাসায় ফিরে আসার পর মোবারক সাহেবের স্ত্রী তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? তোমার একী চেহারা হয়েছে ?"
মোবারক সাহেব বললেন, "আমি চাকরী ছেড়ে দেব।"
মোবারক সাহেবের স্ত্রী চমকে উঠে বললেন, "কেন ?"
"আমাকে বলেছে সবাইকে পাশ করাতে হবে। বলেছে কেউ ফেল করার জন্যে পরীক্ষা দেয় না - পাশ করার জন্যে পরীক্ষা দেয়। পাশ না করলে দোষ আমার।"
মোবারক সাহেবের স্ত্রী বুঝতে না পেরে বললেন, "কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে তুমি কেমন করে ঠিক করে লেখাপড়া করাবে ?"
মোবারক সাহেব মাথা নাড়লেন, বললেন, "না, না, লেখাপড়া করে পাশ করানোর কথা বলেনি।"
"তাহলে ?"
"বলেছে খাতায় একটু আঁকিবুঁকি করলেই মার্ক দিতে হবে। পাশ করাতে হবে। যত বেশী পাশ সরকারের তত বেশি ক্রেডিট। তত বেশী সোনার বাংলা।"
মোবারক সাহেবের স্ত্রী তবুও বুঝতে পারলেন না। বললেন, "কিন্তু - "
"এর মাঝে কোন কিন্তু নাই। একজন মাস্টার হয়ে আমি এটা করতে পারব না। হাঁটুর বয়সী ছেলে বড় অফিসার হয়ে আমাকে ধমকাধমকি করে - আমার পক্ষে এই অপমান সহ্য করা সম্ভব না।"
মোবারক সাহেবের স্ত্রী তার স্বামীকে ভাল করে চিনেন, একবার মাথায় ঢুকে গেলে আসলেই চাকরী ছেড়ে ছুড়ে দিতে পারে।

স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "প্লীজ তুমি মাথা গরম করো না। চাকরী ছেড়ে দিলে আমরা খাব কী ? থাকব কোথায়, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার কী হবে ? তুমি যেহেতু চাকরী করছ ওপরের নির্দেশ তো মানতে হবে ?"
মোবারক সাহেব বিড় বিড় করে বললেন, "উপরের নির্দেশ লিখিত দেয়ার সাহস নাই। শুধু মুখে বলে। আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি চাকরী ছেড়ে দিব।"

২.

মোবারক সাহেব অবশ্যি শেষ পর্যন্ত চাকরী ছাড়লেন না, ছাড়া সম্ভব না। তাই তাদের সব সহকর্মীদের ডেকে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নির্দেশের কথা জানালেন, বললেন, ছেলেমেয়েরা ফেল করার জন্যে লেখাপড়া করে না, পাশ করার জন্যে লেখাপড়া করে। ছেলেমেয়েরা যেহেতু পাশ করার জন্যে লেখাপড়া করে তাই কেউ যদি নিজে থেকে পাশ করতে না পারে তাহলে তাকে পাশ করিয়ে দিতে হবে। এটা সরকারের দায়িত্ব। তারা সরকারী কর্মচারী তাদের দায়িত্ব সরকারের ইচ্ছা পূরণ করা। মোবারক সাহেবের কর্মীরা বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ তারা পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেলেন তারপর কাজ শুরু করে দিলেন। পরীক্ষার সাথে যুক্ত সবাইকে নিয়ে মিটিংয়ের পর মিটিং করতে লাগলেন, ডিসিদের সাথে কথা বললেন, স্কুলের হেডমাস্টারদের ডেকে পাঠালেন, পরীক্ষকদের ডেকে পাঠালেন।

মোটামুটি কোন ঝামেলা ছাড়াই সবাইকে সরকারের ইচ্ছার কথা জানিয়ে দেয়া হল। ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু পাশ করার জন্যে লেখাপড়া করতে এসেছে তাই তাদের পাশ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। শুধু একটা মিটিংয়ে খিটখিটে বুড়ো মতন একজন মানুষ ঝামেলা শুরু করল, তেড়িয়া হয়ে বলল, "আমি ঠিক বুঝবার পারলাম না। পোলাপান পরীক্ষার খাতায় কিছু না লিখলেও তাগো পাশ করাইতে হবে ?"
যিনি মিটিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "কিছু না লিখা মানে কী ? পরীক্ষার খাতায় সবাই কিছু না কিছু লিখে।"
"উল্টা পাল্টা ছাতামাতা যাই লিখে তাতেই নম্বর ?"
"এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা। সৃজনশীল মানে বুঝেন তো ? নিজের মত করে লেখা - একটু ভুল ক্রুটি তো হতেই পারে, দোষ তো ছেলে মেয়েদের না। দোষ সিস্টেমের। ছেলে মেয়েদের ভিক্টিমাইজ করে লাভ কী ? তাই বলছি উদার ভাবে মার্ক দিবেন। বুঝেছেন ?"
খিটখিটে বুড়ো বলল, "না, বুঝি নাই। পাশ মার্ক না পাইলে আমি পাশ করাবার পারুম না।"
মিটিংয়ের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি এবার রেগে উঠলেন, বললেন, "আপনি কী চান আপনাকে পরীক্ষকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেই ? সরকারের একটা শুভ উদ্যোগকে এরকম নিগেটিভ ভাবে দেখছেন কেন ?"

খিটখিটে বুড়ো টেবিল থেকে তার ব্যাগটা নিয়ে হাঁটা শুরু করল। মিটিংয়ের পরিচালক আরো রেগে উঠলেন, বললেন, "কী হল ? আপনি কই যান ?"
"আমি মাস্টার মানুষ। নিজের হাতে ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ করবার পারমু না। আপনারা করেন। আল্লাহ্ যেন আপনাদের মাপ কইরে দেয়।"
খিটখিটে বুড়োটা চলে যাবার পর মিটিংয়ের পরিচালক মেঘস্বরে বললেন, "কে ? কে এই বেয়াদপ মানুষটা ? কতো বড় বেয়াদপ ?"
একজন বলল, "মডেল স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক।"
"কী রকম শিক্ষক ?"
"খুব ভালো। তবে ঘাড় ত্যাড়া, প্রাইভেট পড়ালে লাখ টাকা কামাতে পারে, পড়ায় না। তাই নিয়ে বউয়ের সাথে রাত-দিন ঝগড়া। সংসারে অশান্তি - "
"কতো বড় সাহস। আমাকে জ্ঞান দেয়। নিশ্চয়ই রাজাকার!"
"জে না। মুক্তিযোদ্ধা ছিল।"
"এইরকম মুক্তিযোদ্ধা আমার অনেক দেখা আছে।" মিটিংয়ের পরিচালক গজ গজ করতে লাগলেন।

তবে "ঘাড় ত্যাড়া" শিক্ষক খুব বেশী পাওয়া গেল না, বিষয়টা নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকলেও প্রায় সবাই এই নূতন পদ্ধতি মেনে নিলেন, ছাত্রছাত্রীদের যেভাবে সম্ভব পাশ করাতে হবে।

৩.

সবুজ মুখে সিগারেটটা চেপে রেখে তার চুলে জেল দিচ্ছিল তখন তার মা ঘরে এসে ঢুকলেন, মা'কে দেখে সবুজ তাড়াতাড়ি তার সিগারেটটা হাত দিয়ে ধরে পিছনে লুকিয়ে ফেলল, মা দেখেও না দেখার ভান করলেন, বললেন, “বাবা, তোর পরীক্ষা তো এসে গেল। একটু বই নিয়ে বসবি না ?”
সবুজ উদাস মুখে বলল, “নাহ্ আম্মু। ঠিক করেছি এই বছর পরীক্ষা দেব না।”
“কেন? পরীক্ষা দিবি না কেন ?”
সবুজ বিরক্ত হয়ে বলল, “পরীক্ষা দিতে হলে লেখাপড়া করতে হয়। আমি কোনো লেখাপড়া করি নাই। ইন্টারের সিলেবাস কত বড় তুমি জান ?”
মা ভয় পাওয়া গলায় বলল, “তোর বাবা শুনলে খুব রাগ করবে।”
সবুজ আরো বিরক্ত হয়ে বলল, “বাবার শোনার দরকার কী ? থাকে সৌদি আরবে, মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে তার দায়িত্ব শেষ। আমি পরীক্ষা দিলাম কি না দিলাম তাতে বাবার কী আসে যায় ?”

মা আরেকটু কাছে এসে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, “প্লিজ বাবা প্লিজ! পরীক্ষাটা দে।”
সবুজ মায়ের হাত সরিয়ে বলল, “আহ মা! তুমি বড় বিরক্ত কর। যাও দেখি।”

মা কাতর গলায় বললেন, বাবা, "আমি তো বলি নাই তোর পরীক্ষা দিয়ে গোল্ডেন ফাইভ পেতে হবে। শুধু বলেছি পরীক্ষাটা দে।"
"পরীক্ষা দিলে ফেল করব।"
"তবু পরীক্ষাটা দে।"
"আমার কোনো বইপত্র পর্যন্ত নাই। কোনো কোচিং করি নাই।"
"তোকে সব বই কিনে দেব।"
"কিন্তু খাতায় আমি কী লিখব ? আউল ফাউল জিনিস ?"
"যা ইচ্ছে তাই লিখবি বাপ। তবু পরীক্ষাটা দে। তোর বাবাকে বলতে পারব তুই পরীক্ষা দিয়েছিস। রেজাল্ট খারাপ হলে কিছু একটা বলা যাবে।"

শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে সবুজ পরীক্ষা দিতে রাজি হলো। তবে এক শর্তে সে কোনো লেখাপড়া করতে পারবে না।

৪.

রনি রাত নয়টার সময় বাসায় ফিলে এলো, তখন তার দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নাই। প্রথমে কোচিং তারপর গণিত স্যারের কাছে প্রাইভেট, তারপর ফিজিক্স স্যারের কাছে ব্যাচে পড়া। বাসায় ফিরে আসতে প্রত্যেকদিনই দেরি হয়। স্যারেরা সাজেশন দিয়েছে আজকে রাত জেগে মুখস্থ করতে হবে, চিন্তা করেই রনির মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মা রনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আয় বাবা হাত-মুখ ধুয়ে খেতে আয়। মুখটা শুকিয়ে দেখি এতটুকু হয়ে গেছে।"

রনি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার ইচ্ছা ছিল বাংলা কিংবা ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ার। সেটা যদি না হয় তাহলে সাংবাদিকতা পড়া - ঘাড়ে ক্যামেরা নিয়ে সাংবাদিক হয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে সব সময়েই সে এরকম একটা স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু রনির বাবা মা তার স্বপ্নকে কোনো দাম দেননি, জোর করে তাকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়িয়েছেন, তাকে জোর করে ডাক্তার না হয় ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। বাধ্য হয়ে সে গণিত পড়ছে, ফিজিক্স পড়ছে, কেমেস্ট্রি পড়ছে। বুঝতে খুব কষ্ট হয় তাই সে সবকিছু মুখস্থ করে ফেলার চেষ্টা করে। মুখস্থ করতে কী কষ্ট, রাত্রি বেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন সে একা একা বই মুখস্থ করে। মনে মনে ভাবে তাদের জীবনটা এত কষ্ঠের কেমন করে হলো ?

খাবার টেবিলে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "রনি, তোমার পরীক্ষার প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে ?"

রনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সত্যি কথাটাই বলল, “ভালো না আব্বু।”
বাবা ভুরু কুচকে জিজ্ঞেস করলেন, “কেন ভালো না ?”
“আমার সায়েন্স বুঝতে কষ্ট হয়। তাই না বুঝে সবকিছু মুখস্ত করতে হয়।”
"লেখাপড়া করলে তো একটু-আধটু মুখস্ত করতেই হয়। "
“একটু আধটু নয় আব্বু, পুরো বই মুখস্ত করতে হয়। আমার সায়েন্স নেওয়াটা ভুল হয়েছে - তোমরা জোর করে সায়েন্সে ঢুকিয়ে দিলে।”

মা রনির প্লেটে মুরগীর একটা রান তুলে দিয়ে বললেন, “কোনো চিন্তা করিস না বাবা দেখিস তোর পরীক্ষা খুব ভালো হবে। নির্ঘাত গোল্ডেন ফাইভ।”
রনি দুর্বল ভাবে হাসল, বলল, “গোল্ডেন ফাইভ না আরো কিছু। শুধু কোনোভাবে টেনেটুনে পাস করলেই আমি খুশি।”

৫.

প্রিয়াংকা পড়ার টেবিলে বসে তার বইটির দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তে সত্যিকার অর্থে সে কিছু দেখছিল না। পাশে তার মা হাতে কয়েকটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রিয়াংকাকে বললেন, ‘মা, একবার দেখ।’

“প্রিয়াংকা কঠিন গলায় বলল না। দেখব না।”
“দেখ মা। সবাই দেখছে তুই কেন দেখবি না ? ”
“না মা। তুমি আমাকে দেখতে বল না। আমি ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দেখে পরীক্ষা দেব না।”
মা বললেন, “সবার পরীক্ষা ভালো হবে, গোল্ডেন ফাইভ পাবে, শুধু তুই পাবি না। তখন তুই মন খারাপ করবি।”
“করলে করব। কিন্তু আমি ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দেখব না। দেখব না দেখব না দেখব না। আমাকে তুমি অন্যায় কাজ করতে বল না।”
“এটা তো অন্যায় না মা। সবাই যেটা করে সেটা অন্যায় হবে কেমন করে? এটাই তো নিয়ম।”
“আমি এই নিয়ম মানি না।” প্রিয়াংকা দুই হাত দিয়ে তার চোখ বন্ধ করে টেবিলের ওপর ঝুকে পড়ল। মা দেখলেন তার দুই হাতের ফাঁক দিয়ে চোখের পানি ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

পৃথিবীর সব ছেলে-মেয়ে একরকম, কিন্তু তার মেয়েটি কেন অন্যরকম হয়ে জন্ম নিল ? মা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নগুলো হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৬.

পরীক্ষার হলে সবুজ প্রথম এক দুইদিন প্রশ্নটা একটু পড়ার চেষ্টা করলেও শেষের দিকে সেটাও ছেড়ে দিলো, প্রশ্ন পড়ে সে আগা-মাথা কিছুই বুঝে না তাহলে শুধু শুধু পড়ে কী লাভ ? শুধু মাকে খুশী করার জন্যে সে পরীক্ষা দিতে এসেছে। তাই পরীক্ষার খাতায় যা মনে আসে তাই লিখে এল। কোনো মাথামুন্ডু নেই সেই রকম অবান্তর কথা। পরীক্ষার প্রশ্নে যে শব্দগুলো আছে সেই সব শব্দ দিয়ে তৈরী একটা দুইটা বাক্য, কখনো আস্ত প্যারাগ্রাফ। যে পরীক্ষার খাতা দেখবে তার কাছে যেন মনে হয় আসলেই বুঝি পরীক্ষার উত্তর লিখছে। এক ধরণের তামাশা বলা যায়।

রনির পরীক্ষা যত খারাপ হবে বলে ভেবেছিল তত খারাপ হলো না। প্রশ্নগুলো ফাঁস হয়েছিল বলে রক্ষা কিন্তু তবুও খুব লাভ হয়নি, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর সে প্রাণপনে মুখস্ত করে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এতো কিছু তার মনে থাকে না। তবুও সে লিখে এসেছে, হিসেব করে দেখেছে টেনে টুনে জিপিএ ফোর হয়ে যাবে। তার জন্যে জিপিএ ফোর অনেক।

প্রিয়াংকার জন্যে পরীক্ষাগুলো ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। সে ভালো স্কুলে পড়ে তার ক্লাশের সবাই ভালো ছাত্রী। সবাই ফাঁস হয়ে আসা প্রশ্নগুলো দেখে এসেছে। প্রশ্নটা হাতে পেয়েই সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে শুধু সে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। সবাই যখন টানা মুখস্ত লিখে যাচ্ছে সে তখন চিন্তা করে লিখেছে। মনটা ভালো নেই ভেতরে উৎসাহ নেই তা না হলে পরীক্ষা আরও ভালো হত। পরীক্ষার উত্তর দিতে দিতে মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে আসে। নিজেকে বুঝিয়ে শান্ত করে সে দাঁতে দাঁত চেপে পরীক্ষা দিচ্ছে।

প্রশ্নটা হাতে নিয়ে তার চোখে পানি এসে যায়, এতো বড় একটা অন্যায় কিন্তু দেশে কোনো প্রতিবাদ নেই। মন্ত্রী বলছেন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়নি, এগুলো সাজেশান। সাজেশান ? প্রিয়াংকার ইচ্ছা করে টেবিলে মাথা কুটে রক্ত রক্ত বের করে ফেলে। খোদা তাকে কেন এমন একটা দেশে জন্ম দিল ? কেন ?

৭.

পরীক্ষার ফল বের হয়েছে - সবার ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা। শুধু সবুজের পরীক্ষা নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই, তার নিজের ফলাফল জানার কোনো আগ্রহ নেই। সৌদি আরবে বাবাকে কিছু একটা জানাতে হবে, পরীক্ষার আগে ডেঙ্গু হয়ে গিয়েছিল তাই ভালো করে পরীক্ষা দিতে পারেনি এরকম একটা গল্প বলা যাবে।

দুপুরের দিকে সবুজের একজন বন্ধু তাকে ফোন করে জানাল সবুজ নিশ্চয় পাশ করেছে, কারন তার কলেজে শতভাগ পাশ! তার এই বন্ধু একটু ঠাট্টা তামাশা বেশী করে তাই ইয়ারকী করছে ভেবে সবুজ ফোন রেখে দিলেও তার ভেতরটা খচখচ করতে লাগল। সে সাহস করে মোবাইলে খোঁজ নিয়ে দেখে সে সত্যিই পাশ করে ফেলেছে - জিপিএ খুব খারাপ কিন্তু পাশ! সবুজ একটা গগন বিদারী চিৎকার দিল এবং সেই চিৎকার শুনে মা ভয় পেয়ে ছুটে এলেন। সবুজ মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আম্মু, আমি পাশ করেছি!"

মায়ের মুখ একশ ওয়াট বাল্বের মতো জ্বলে উঠল, ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি জানতাম তুই পাশ করবি ! তোর মতো ছেলে কয়টা আছে, একেবারে না পড়ে পরীক্ষা দিয়ে তুই পাশ করে ফেলেছিস, একটু যদি পড়তি তাহলে কী হতো চিন্তা করতে পারিস ?"

সবুজ আসলেই চিন্তা করতে পারে না, সে কেমন করে পাশ করেছে সেটাও বুঝতে পারে না। নিশ্চয়ই পরীক্ষার খাতায় সে যেগুলো লিখেছিল সেগুলো খুবই সৃজনশীল লেখা ছিল সে জন্যেই তাকে পাশ করিয়ে দিয়েছে।

মা ছেলের হাতে সৌদি আরবে থাকা বাবার পাঠানো টাকা থেকে এক হাজার টাকা বের করে দিয়ে বললেন, "যা বাবা মিষ্টি কিনে আন।"

সবুজ মিষ্টি কিনতে গিয়ে দেখে সব মিষ্টি বিক্রি হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত কিছু নিমকি কিনে আনল। পাশ করলে শুধু মিষ্টি খেতে হবে কে বলেছে? মাঝে মাঝে নোনতা জিনিষও খাওয়া যায়।

৮.

রনি গোল্ডেন ফাইভ পেয়েছে। আব্বু আম্মু খুব খুশী কিন্তু রনি নিজে হিসাব মিলাতে পারছে না, সে অনেকবার হিসেব করে দেখেছে, সেখানে কিছুতেই জিপিএ ফাইভ হওয়ার কথা না। কিন্তু হয়ে গেছে - সে নিজের চোখে দেখেছে।

বাবা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দেখেছিস ? আমি বলেছিলাম না তুই পারবি! এই দেখ তুই পেরেছিস।"

আম্মু বললেন, "মানত করেছিলাম পাগলা বাবার মাজারে এক হাজার টাকা দিব। এক্ষুনি টাকাটা পাঠাতে হবে।"

শুধু ছোট বোনটা ঠোঁট উল্টে বলল, "গোল্ডেন ফাইভ এমন কী ব্যাপার, সবাই পায়!"

আম্মু ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর পাজী মেয়ে। তুই এমন হিংসুটে হলি কেমন করে ?"

রাতে ঘুমানোর সময় রনির মনে হতে লাগল আসলে এতোদিন সে নিজের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখেছে। সে আসলে অসম্ভব প্রতিভাবান। বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবীদের একজন - এখন ইচ্ছা করলে সে বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবে। সে ইচ্ছা করলে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না হলে ডাক্তার হতে পারবে। বিশাল একটা ইঞ্জিনিয়ার না হয় বড় একজন ডাক্তার হয়ে সে তার মতো আরেকজন মেধাবী মেয়েকে বিয়ে করবে ! ফুটফুটে চেহারার সুন্দরী একটা মেয়ে ।

রনি বিছানায় এপাশ ওপাশ করে, আনন্দে চোখে ঘুম আসতে চায় না।

৯.

প্রিয়াংকার গোল্ডেন ফাইভ হয়নি। ফিজিক্সে একটুর জন্যে ছুটে গেছে। তার ক্লাশের সব মেয়ের গোল্ডেন হয়েছে। হাবাগোবা যে মেয়েটা কিছু পারে না যে সবসময় প্রিয়াংকার কাছে পড়া বুঝতে আসতো সেও গোল্ডেন পেয়েছে। শুধু সে পায়নি। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন না দেখলে এরকম তো হতেই পারে। প্রশ্ন তো যথেষ্ঠ কঠিন হয়েছিল। এই প্রশ্নে জিপিএ ফাইভ তোলা তো সোজা কথা না।

প্রিয়াংকার স্কুলের সিড়িতে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। অন্যরা সবাই চেচামেচি করছে। হঠাৎ করে দরজা খুলে টেলিভিশন ক্যামেরা হাতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক এসে ঢুকলো।

একজন ক্যামেরা তাদের দিকে তাক করে বলল, "তোমরা কী খুশী ?"
সবাই চিৎকার করে বলল,"হ্যাঁ খুশি।"
"তাহলে আনন্দ করছ না কেন ?"

সবগুলো মেয়ে তখন আনন্দে চিৎকার করতে লাগলো, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরতে লাগলো, লাফাতে লাগল, নাচতে লাগল। শুধু প্রিয়াংকা একা চুপচাপ সিড়িতে বসে রইল।

১০.

সবুজ একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। এই ইউনিভার্সিটি নিয়ে পত্র পত্রিকায় মাঝে মাঝেই লেখালেখি হয়, কাউকে লেখাপড়া করতে হয় না, ক্লাশে যেতে হয় না, প্রতি সেমিস্টারে গ্রেড চলে আসে। কয়েক বছর নিয়মিত টাকা দিয়ে গেলেই সার্টিফিকেট। সবুজ একটা বিবিএর সার্টিফিকেট নিয়ে নেবে।

রনি যতগুলো সম্ভব সবগুলো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে, কোথাও টিকতে পারেনি।

সত্যি কথা বলতে কী কোথাও পাশ করতে পারেনি। প্রথম দিকে বাবা মা উৎসাহ আর সাহস দিয়েছেন শেষের দিকে তারা প্রথমে হতাশ তারপর বিরক্ত এবং শেষে কেমন যেন ক্ষেপে উঠলেন।

একদিন খাবার টেবিলে বাবা বলেই বসলেন, “তুই কী রকম ছাত্র ? ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাওয়া দুরের কথা - কোথাও পাশ পর্যন্ত করতে পারিস না ?”
রনি দুর্বল গলায় বলল, “আমি তো চেষ্টা করছি !”
“এই চেষ্টার নমুনা?” বাবা হুংকার দিলেন, “এই গোল্ডেন ফাইভ ? এর জন্যে আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোদের জন্যে পরিশ্রম করি ? সামান্য একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাস না ?”
রনি কাদোঁ কাদোঁ গলায় বলল, “আমি কী করব ?”
“দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে - দূর হয়ে যা।”

রনি খাবার টেবিল থেকে উঠে গেল। রাত্রি বেলা বাথরুমে রাখা এক বোতল হারপিক খেয়ে ফেলল। মাঝ রাতে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি। জানে বেচেঁ গেল কিন্তু ভেতরটা ঝলসে গিয়ে খুব খারাপ অবস্থা।

প্রিয়াংকা খুব শক্ত মেয়ে ছিল কিন্তু এক সময় সেও ভেঙ্গে পড়ল। একদিন হাউমাউ করে কেঁদে তার মা’কে জড়িয়ে ধরে বলল, “মা আমাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দাও, এই দেশে আমি আর থাকতে পারছি না।”

মা অবাক হয়ে বললেন, “সে কী ? তুই না তোর দেশকে এতো ভালোবাসিস? সব সময়ে বলেছিস দেশের জন্যে কিছু একটা করবি ?”
“হ্যাঁ মা বলেছিলাম।”
“তোর না দেশ নিয়ে এতো স্বপ্ন ছিল ?”
“ছিল মা। এখন আর কোনো স্বপ্ন নাই।”

মা অবাক হয়ে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন - এই মেয়েটির চোখে এখন আর কোনো স্বপ্ন নেই ?

১১.

গল্পটা এখানে শেষ। এটা কাল্পনিক গল্প, নামগুলো বানানো কিন্তু ঘটনাগুলো সত্যি। “প্রিয়াংকা”র ই-মেইলটা আমার কাছে আছে। যাদের দায়িত্বে এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তারা কী জানেন এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এখন কী ভয়ংকর অবস্থা ? শতভাগ পাশ করিয়ে দেওয়ার এই মহা পরিকল্পনায় সবচেয়ে এগিয়ে মাদ্রাসা - তারা ৯৫% পাশ করেছে। ৯৫% ? আমাকে চোখ কচলে দুইবার দেখতে হয়েছে বিশ্বাস করার জন্যে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নিজে এই সংখ্যাটি বিশ্বাস করেন ? ঢাকা বোর্ড ৮৫% যশোর বোর্ড ৬০%। যশোরের বাতাস কী বিষাক্ত ? কেন এতো কম ছেলেমেয়ে পাশ করল ? আমি কী বাজী ধরে বলতে পারি না সামনের বছর এক লাফে যশোর বোর্ড এগিয়ে যাবে - যেভাবে সিলেট বোর্ড এগিয়ে গিয়েছিল? ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে কার জন্যে এই প্রহসন ? দেশ ধ্বংস করার কার এই মহা পরিকল্পনা ?

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ালে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাদের হিসেবে প্রশ্ন ফাঁস হয়নি - সেগুলো ছিল “সাজেশান”। আমি যখন প্রশ্ন ফাঁসের কথা বলেছি তখন সেটা নিশ্চয়ই ছিল “বিভ্রান্তি ছড়ানো”। আমার নিশ্চয়ই শাস্তি পাওনা হয়েছে।

আমি আগ্রহ নিয়ে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি আমার ভাগ্যে কী শাস্তি রয়েছে !

দশ হাজার কোটি নিউরন

১.

সপ্তাহ দুয়েক আগে একজন আমাকে লিখে জানিয়েছে চারপাশের সবকিছু দেখে তার খুব মন খারাপ - আমি কী এমন কিছু লিখতে পারি যেটা পড়ে তার মন ভালো হয়ে যাবে? চিঠিটি পড়ে আমি একটু দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম, কারণ ঠিক তখন এই দেশের লেখাপড়া নিয়ে আমি খুব দুঃখের একটা গল্প লিখেছি। সেটা লিখেছি রেগে মেগে, লেখা শেষ করে পড়ে আমার নিজেরই মন খারাপ হয়ে গেছে! আমার নিজের জন্যেই এমন কিছু একটা লেখা দরকার যেটা আমাকে ভবিষ্যত নিয়ে স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করবে। সেটা করার জন্যে আমি সব সময়েই এই দেশের ছেলে মেয়েদের কাছে ফিরে যাই। আমাদের দেশের লেখকেরা ছেলে মেয়েদের জন্যে লিখতে চান না, আমি লিখি। আমার খুব সৌভাগ্য এই দেশের ছেলেমেয়েরা আমার ছোটখাটো লেখালেখি অনেক বড়োসড়ো ভালোবাসা দিয়ে গ্রহন করেছে। আমার জন্যে এই ভালোবাসা প্রকাশ করতে তারা কার্পণ্য করে না। যখন বিজ্ঞান কংগ্রেস, গনিত বা পদার্থবিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে যাই, আমাকে যখন স্টেজে তুলে দেয়া হয়, সেই স্টেজে বসে আমি যখন সামনে বসে থাকা শিশু কিশোরদের বড় বড় উজ্জল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি, মূহুর্তে আমার মনের ভেতরকার সব দুর্ভাবনা দূর হয়ে যায়। আমাদের কী সৌভাগ্য আমাদের দেশে এতো চমৎকার একটা নূতন প্রজন্ম বড় হচ্ছে!

আমাদের দেশে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি - কিংবা কে জানে হয়তো আরো বেশী হতে পারে! পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশে ছেলে বুড়ো সব মিলিয়েও তিন কোটি দূরে থাকুক এক কোটি মানুষও নেই। আমাদের এই তিন কোটি ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে, তারা যদি শুধু ঠিক করে লেখাপড়া করে তাহলে এই দেশে কী সাংঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটে যাবে কেউ কল্পনা করতে পারবে?

এই সহস্রাব্দের শুরুতে পৃথিবীর জ্ঞানী গুনী মানুষেরা সম্পদের একটা নূতন সংজ্ঞা তৈরী করেছেন, তারা বলেছেন জ্ঞান হলো সম্পদ। তার অর্থ একটা বাচ্চা যখন ঘরের মাঝে হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়ে একটা অংক করে তখন আমার দেশের সম্পদ একটুখানি বেড়ে যায়। যখন একটি কিশোর বসে বসে এক পাতা ইংরেজী অনুবাদ করে আমার দেশের সম্পদ বেড়ে যায়। যখন একজন কিশোরী রাতের আঁধারে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদটা কেমন করে বড় হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করে তখন আমার দেশের সম্পদ বেড়ে যায়। মাটির নিচে খনিজ সম্পদ তৈরী হতে কোটি কোটি বছর লাগে, কল কারখানায় শিল্প সম্পদ তৈরী করতে যুগ যুগ লেগে যায়। কিন্তু লেখাপড়া করে জ্ঞানের সম্পদ তৈরী হয় মূহুর্তে মুহুর্তে। আমাদের দেশের লেখাপড়া নিয়ে আমার অভিযোগের শেষ নেই সেটা এখন সবাই জানে - কিন্তু আজকে আমি অভিযোগ করব না।

আজকে আমি শুধু সবাইকে মনে করিয়ে দেব এই দেশের তিন কোটি বাচ্চা প্রতি বছর নূতন বই হাতে নিয়ে লেখা পড়া করতে শুরু করে - শুধুমাত্র এই বিষয়টা চিন্তা করেই আমাদের সবার মনের সব দুশ্চিন্তা সব দূর্ভাবনা দূর হয়ে যাবার কথা!

লেখা পড়া বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে কোনো একটি শিশু বই সামনে নিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সুর করে পড়ছে। শুধু তাই না "পড়া মুখস্ত" করা বলে একটা কথা মোটামোটি সবাই গ্রহন করেই নিয়েছে। কিন্তু মুখস্ত করাই যে লেখাপড়া না, বোঝা, ব্যবহার করা কিংবা নিজের মত বিশ্লেষন করাও যে লেখাপড়া করার একটা অংশ সেটা মাত্র অল্প কয়দিন হল আমরা সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। যে জিনিষটা এখনো আমরা কাউকে বোঝাতে শুরু করিনি কিংবা বোঝাতে পারিনি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র জিপিএ ফাইভ পাওয়া মোটেই লেখাপড়া না!

আমাদের অনেক ধরনের বুদ্ধিমত্তা আছে। আমরা শুধু এক ধরনের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মাথা ঘামাই - সেটা হচ্ছে ক্লাশরুমে লেখাপড়া করে পরীক্ষার হলে সেটা উগলে দেওয়ার বুদ্ধিমত্তা! কিন্তু আমরা সবাই জানি লেখাপড়ার বাইরে যে বুদ্ধিমত্তা গুলো আছে সেগুলো কিন্তু লেখাপড়ার মতই, এমন কী অনেক সময় লেখাপড়া থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা শিক্ষকতা করি তাড়া সবাই দেখেছি আমাদের ক্লাশে যে ছেলেটি বা মেয়েটি সবচেয়ে তুখোড়, সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে কিন্তু অনেক সময়েই পরীক্ষায় সেরকম ভালো করতে পারে না। দোষটি মোটেও তার নয় - দোষ আমাদের, আমরা ঠিক করে পরীক্ষা নিতে পারি না। সারা পৃথিবীতেই মনে হয় এই সমস্যাটা আছে, একজনের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার পদ্ধতি মনে হয় এখনো ঠিক করে আবিষ্কার করা যায়নি। যখন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বাইরের বড় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে চায় তখন আমাদের তাদের সম্পর্কে লিখতে হয়। আমি দেখেছি সেই ফর্মগুলোতে প্রায় সবসময়েই আমাদের একটা প্রশ্ন করা হয়ঃ "এই ছেলেটির পরীক্ষার ফলাফল কী তার সঠিক মেধা যাচাই করতে পেরেছে?" আমাকে প্রায় সময়েই লিখতে হয়, "না, পারেনি! পরীক্ষার ফলাফল দেখলে মনে হবে সে বুঝি খুবই সাধারন - কিন্তু বিশ্বাস কর, এই ছেলেটি বা মেয়েটি আসলে কিন্তু অসাধারণ!"

বুদ্ধিমত্তা অনেক পরের ব্যাপার আমরা কিন্তু জিপিএ ফাইভ নামের একটা কানাগলি থেকেই বের হতে পারিনি! আমরা ধরেই নিয়েছি যে কোনো মূল্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের জিপিএ ফাইভ পেতে হবে - দরকার হলে প্রশ্ন ফাঁস করে হলেও। কিন্তু যে ছেলেটি বা মেয়েটি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাবার পরও সেই প্রশ্ন না দেখে পরীক্ষা দিয়ে ভালো করেছে সে কী অন্য সবার থেকে আলাদা নয়? তার বুদ্ধিমত্তাটা কী আমরা আলাদাভাবে ধরতে পেরেছি? পারিনি! কিংবা যে ছেলেটি বা মেয়েটি ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন দেখার সুযোগ পেয়েও দেখেনি - সেজন্যে পরীক্ষা তত ভালো হয়নি - তার ভেতরে যে এক ধরনের অন্যরকম শক্তি রয়েছে আমরা কী কখনো সেটা যাচাই করে দেখেছি ? সেটাও দেখিনি।

প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র একটা পরিবারের একটা মেয়ে যখন সারাদিন তার ছোট ভাইকে কোলে করে মানুষ করে, তার ফাঁকে ফাঁকে লেখা পড়া করে পরীক্ষায় টেনেটুনে পাশ করেছে আমরা কী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা কম? শহরের স্বচ্ছল পরিবারের একটি মেয়ে যে গাড়ী করে স্কুলে যায়, ফেসবুক ইন্টারনেট করে সময় কাটায়, সুন্দর করে ইংরেজী বলে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে - আমরা কী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব তার বুদ্ধিমত্তা গ্রামের মেয়েটি থেকে বেশী ?

আসলে সেটি পারব না। কাজেই আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে শুধুমাত্র পরীক্ষার রেজাল্ট কিংবা জিপিএ ফাইভ দেখে একজন ছেলে বা মেয়ের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করাটা নেহায়েতই বোকামী। আমাদের চোখ কান খোলা রেখে দেখতে হবে একটা শিশুর মাঝে আর কোন কোন দিকে তার বিচিত্র বুদ্ধিমত্তা আছে। আমাদের নিজেদের ভেতর যদি বিন্দুমাত্র বুদ্ধিমত্তা থাকে তাহলে আমরা কখনোই শুধুমাত্র পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ে একটা ছেলে বা মেয়েকে যাচাই করে ফেলার চেষ্টা করব না! আমার সেইসব ছেলেমেয়েদের জন্যে খুব মায়া হয় যাদের বাবা মায়েরা শুধুমাত্র পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পাওয়ানোর প্রতিযোগিতায় নিজেদের সন্তানদের ঠেলে দিয়ে তাদের শৈশবের সব আনন্দ কেড়ে নিয়েছেন! তাদের থেকে বড় দুর্ভাগা মনে হয় আর কেউ নেই!

২.

মাও সে তুংয়ের একটা খুব বিখ্যাত উক্তি আছে। উক্তিটি হচ্ছে এরকম, প্রত্যেকটি মানুষ একটা মুখ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু সে মুখে অন্ন যোগানোর জন্যে তার রয়েছে দুটি হাত! যার অর্থ এই পৃথিবীতে কোনো মানুষই অসহায় নয়-খেটে খাওয়ার জন্যে সবারই দুটি হাত রয়েছে, কাস্তে কিংবা কুঠার ধরে সেই হাত তার মুখে অন্ন জোগাবে।

আমি মাও সে তুং নই তাই আমার উক্তিকে কেউ গুরুত্ব দিবে না কিন্তু আমাকে সুযোগ দিলে আমি মাও সে তুংয়ের উক্তিটাকে অন্য রকম করে বলতাম। আমার উক্তিটি হতো এরকম: প্রত্যেকটি মানুষ একটা মুখ ও দুটি হাত নিয়ে জন্মায়। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই কারণ সব মানুষের মাথায় রয়েছে দশ হাজার কোটি নিউরন!

যত দিন যাচ্ছে আমি আমাদের মস্তিস্কের দশ হাজার কোটি নিউরনকে ততো বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শুরু করেছি। কেও যদি আমাকে জিগ্যেস করে তুমি তোমার শিক্ষকতা জীবনের কোন অভিজ্ঞতাটুকুকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো? আমি বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে বলব যে সেটি হচ্ছে একজন মানুষের মাথার ভেতরকার সোয়া কেজি ওজনের মস্তিস্ক নামের রহস্যময় জিনিষটির অসাধারণ ক্ষমতা!

প্রায় সময় আমি অনেক ছেলে মেয়েকে হতাশ হয়ে বলতে শুনি, "আমি আসলে গাধা, আমার মেধা বলতে কিছু নেই।" তাদের অনেকের কথার সত্যতা আছে - পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে করতে এবং পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে পেতে তাদের অনেকেই আসলে খানিকটা "গাধা" হয়ে গেছে - কিন্তু সত্য কথাটি হচ্ছে কাউকেই কিন্তু সেটা মেনে নিতে হবে না। আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করেছি যে কেউ যদি সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা করে তাহলে কত দ্রুত সে নতুন মানুষ হয়ে যেতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নামে একটা ভয়ংকর অমানবিক প্রক্রিয়া ঘটানো হয়, সে প্রক্রিয়া দিয়ে আমরা "মেধাবী" সিল দিয়ে কিছু ছেলে মেয়েকে ভর্তি করি। তার মাঝেও আবার জনপ্রিয় আর অজনপ্রিয় বিভাগ আছে। যারা জনপ্রিয় বিভাগে ঢুকতে পারে সবাই তাদের দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায় যারা ঢুকতে পারে না তারা গভীর দুঃখে লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা মায়ের গালাগাল শুনে।

অথচ মজার বিষয় হল, আমি খুব পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে জানি এই পুরো বিভাজনটি আসলে অর্থহীন। বিজ্ঞানের জন্যে গভীর ভালোবাসা কিন্তু বাবা-মা জোর করে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বানানোর জন্যে তাদের সন্তানদের একটা কষ্টের জীবনে ঠেলে দেন। আবার উল্টোটাও সত্যি যে, ছেলেটি অসাধারণ একজন ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তার হতে পারত, ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে না পেরে সে হয়তো জোর করে অপছন্দের একটা বিভাগে ভর্তি হয়ে অপছন্দের কিছু বিষয় পড়ে সময়টা অকারণে নষ্ট করছে।

এই মুহূর্তে কম্পিউটার সায়েন্স খুব জনপ্রিয় একটা বিষয়। চাকরি পাবার জন্যে এটা সবসময়েই একটা জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে থাকবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগ থেকে পাস করে ছেলে-মেয়েরা অনেকেই নিজেদের সফটওয়্যার ফার্ম খুলেছে। মজার বিষয় হচ্ছে, এই সফটওয়্যার ফার্মে কিন্তু শুধু কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ছেলে-মেয়েরা নেই অন্য অনেক বিভাগের ছেলে-মেয়েও সমানভাবে আছে। তারা কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের পাস করা ছেলে-মেয়ে থেকে কোনো অংশে কম নয়— তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে। যার অর্থ পছন্দের বিভাগে ভর্তি হতে না পারলেই একজনের জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে মনে করার কোনো কারণ নেই।

ছেলে-মেয়েদের আগ্রহ এবং দেশ কিংবা পৃথিবীর প্রয়োজনীয় কথা মনে রেখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অন্যান্য বিভাগের ছেলে-মেয়েদের জন্যে দ্বিতীয় মেজর (Second Major) হিসেবে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি। (সত্যি কথা বলতে কী সব বিভাগেই দ্বিতীয় মেজর নেয়ার সুযোগ আছে) আমার ধারণা, সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে পড়ালেখা কেমন করে হয় এটি তার একটা চমৎকার উদাহরণ! ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের সব পড়ার পাশাপাশি শুধু আগ্রহের জন্যে বাড়তি পড়াশোনা করছে বিষয়টি দেখলেই এক ধরনের আনন্দ হয়।

একটা সময় ছিল যখন আমি মেধাবী শব্দটাকে ব্যবহার করতাম। আমার চারপাশে অনেক “মেধাবী” ছেলেমেয়েকে দেখে ভাবতাম, সত্যিই কিছু মানুষ “মেধাবী” হয়ে জন্মায় অর্থাত সৃষ্টিকর্তা সত্যিই বুঝি কিছু মানুষকে বেশি মেধা দিয়ে পাঠান। সেই ছাত্রজীবনেই আবিষ্কার করেছিলাম যে, আসলে বাড়তি মেধা বলে কিছু নেই, চারপাশের অনেক মেধাবী মানুষই জীবনযুদ্ধে ঝরে পড়েছে। আবার যাদেরকে নেহায়েতই সাধারণ একজন বলে ভেবেছিলাম, অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি তারা উৎসাহ আগ্রহ আর পরিশ্রম করে “মেধাবী”দের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে! সেগুলো দেখে দেখে আজকাল আমার নিজের ডিকশনারী থেকে “মেধাবী” শব্দটাকে তুলে দিয়ে সেখানে “উৎসাহী” শব্দটা ঢুকিয়েছি। আমি দেখেছি উৎসাহ থাকলে সবই সম্ভব।

সত্যি কথা বলতে কী আমি আমার পরিচিত জগতের সব মানুষকে দু’ভাগে ভাগ করে ফেলেছি। এক ভাগ হচ্ছে যারা উৎসাহী, অন্য ভাগ হচ্ছে যাদের কিছুতেই উৎসাহ নেই, যাদেরকে ঠেলাঠেলি করে নিয়ে যেতে হয়! উৎসাহীরা পৃথিবীটাকে চালায়, বাকিরা তার সমালোচনা করে!

আমার চারপাশে অসংখ্য উদাহরণ আছে যেখানে একজন ছেলে বা মেয়ে শুধু নিজের উৎসাহটুকু দিয়ে এগিয়ে গেছে। এরকম মানুষের সাথে কাজ করাতেও আনন্দ। উৎসাহ বিষয়টা ছোঁয়াচেও বটে। একজনের থেকে আরেকজনের মাঝে সেটা সঞ্চারিত হয়ে যায়। আমি পৃথিবীর অনেক বড় বড় স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি দেখেছি। তাদের সুযোগ-সুবিধে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি - আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কিছুই দিতে পারি না, মাঝে মাঝে শুধু একটুখানি উৎসাহ দিই। সেই উৎসাহকে ভরসা করেই তারা কত কী করে ফেলে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই !

তাই আজকাল সুযোগ পেলেই আমি ছেলে-মেয়েদেরকে বলি, তোমরা যেটুকু প্রতিভা বা মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছো সেটুকুতে সন্তুষ্ট থাকার কোনো কারণ নেই। তুমি ইচ্ছে করলেই সেটাকে শতগুণে বাড়িয়ে ফেলতে পারবে। কাজেই আমি মনে করি পৃথিবীতে আসলে প্রতিভাবান বা মেধাবী বলে আলাদা কিছু নেই, যাদের ভেতরে উৎসাহ বেশি আর যারা পরিশ্রম করতে রাজি আছে তারাই হচ্ছে প্রতিভাবান, তারাই হচ্ছে মেধাবী।

সেজন্যে আমি মাও সে তুংয়ের উক্তিটিতে ‘হাত’ থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেই মস্তিষ্কের দশ হাজার কোটি নিউরনকে। দুটি হাত দিয়ে খুব বেশি কিছু করার সুযোগ নেই কিন্তু মস্তিষ্কের দশ হাজার কোটি নিউরন দিয়ে অচিন্ত্যনীয় ম্যাজিক করে ফেলা সম্ভব। দুটি হাত দিয়ে খুব বেশি হলে এক দুইজন মানুষের মুখে অন্ন জোগানো সম্ভব। দশ হাজার কোটি নিউরন দিয়ে লক্ষ মানুষের মুখেও অন্ন জোগানো যেতে পারে !

৩.

আমি জানি আমাদের সমস্যার শেষ নেই। আমি জানি সব সমস্যার সমাধানও চট করে হয়ে যাবে না - আমাদের দীর্ঘদিন এই সমস্যাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু সেটি নিয়ে হতাশ হবার কিছু নেই - কারন বাংলাদেশ এখন ধীরে ধীরে নিজের পায়ে মাথা তুলে দাড়াচ্ছে।

আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষ তাদের শক্ত দুটি হাত দিয়ে এই দেশকে ধরে রেখেছে। এই দেশের নতুন প্রজন্মকে তাদের পাশে এসে দাড়াতে হবে দশ হাজার কোটি নিউরনকে নিয়ে !

জি পি এ ফাইভ এর অসুস্থ প্রতিযোগিতা, প্রশ্নফাঁস, কোচিং গাইড বইয়ের দৌরাত্ম্য - কোনো কিছুই এই দশ হাজার কোটি নিউরনকে পরাজিত করতে পারবে না।

ইতিহাসের ইতিহাস

১.

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে সবসময়েই আমার বুকের মাঝে এক ধরণের গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা কাজ করে। মাঝে মাঝেই পথে ঘাটে রেল স্টেশনে কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে আমার হয়তো একজন মাঝবয়সী কিংবা বৃদ্ধ মানুষের সাথে দেখা হয়, টুকটাক কথার পর হঠাৎ করে সেই মানুষটি বলেন, "আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা!" আমি তখন সবসময়েই দ্বিতীয়বার তার হাত স্পর্শ করি এবং সেই মাঝবয়সী কিংবা বৃদ্ধ মানুষটির মাঝে আমি টগবগে তেজস্বী একজন তরুণকে খুঁজে পাই। আমি জানি সেই তরুণটি কিন্তু নিজের জীবনকে দেশের জন্যে উৎসর্গ করতেই যুদ্ধে গিয়েছিল। এখন আমরা সবাই জানি কাপুরুষ পাকিস্তান সেনাবাহিনী মাত্র নয় মাসের ভেতর আত্মসমর্পণ করেছিল, একাত্তরে যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়েছিল তারা কিন্তু তখন সেটি জানতো না। তারা সবাই কিন্তু বছরের পর বছর যুদ্ধ করার জন্যেই গিয়েছিল। তাই সবসময়েই আমি মুক্তিযোদ্ধা মানুষটির হাত স্পর্শ করে বলি , "থ্যাংকু! আমাদেরকে একটি দেশ উপহার দেবার জন্যে।"

মাঝে মাঝে কোনো তরুণ কিংবা তরুণীর সাথে আমার দেখা হয়, যে লাজুক মুখে আমাকে বলে, “আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা”, আমি তখন আবার তার মুখের দিকে তাকাই। তার লাজুক মুখের পিছনে তখন আমি তার মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে নিয়ে গর্ব আর গৌরবের আলোটুকু খুঁজে পাই। আমি তখন তার বাবার খোঁজ খবর নিই। বেশিরভাগ সময় আবিষ্কার করি তিনি আর বেঁচে নাই। যদি বেঁচে থাকেন তাহলে আমি সেই তরুণ কিংবা তরুণীকে বলি তাঁর কাছে আমার শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পৌঁছে দিতে।

একাত্তর সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, দেশ স্বাধীন হবার পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ শুরু হয়েছে তখন আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবেরা যারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল তারাও ক্লাশে ফিরে আসতে শুরু করেছে। কমবয়সী তরুণ কিন্তু এর মাঝে তাদের ভেতর কী বিস্ময়কর দেশের জন্যে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা। আমি তাদের দেখি এবং হিংসায় জ্বলে পুড়ে যাই! একাত্তরের নয় মাস মুক্তিযুদ্ধে যাবার জন্যে আমি কম চেষ্টা করিনি - পিরোজপুরের মাঠে দুই একদিন লেফট রাইট করা ছাড়া খুব লাভ হয়নি। আমার বাবাকে মেরে ফেলার পর পুরো পরিবারকে নিয়ে একেবারে বনের পশুর মত দীর্ঘদিন দেশের আনাচে কানাচে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। একটু স্থিতু হয়ে যখন বর্ডার পার হবার পরিকল্পনা করছি তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী মাত্র তেরো দিনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেল - আমার মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। সেই নিয়ে আমার ভেতরে বহুদিন একটা দুঃখবোধ কাজ করতো এবং আমার বয়সী মুক্তিযোদ্ধা দেখলেই আমি হিংসায় জর্জরিত হতাম।

খুব ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সেই (হাস্যকর এবং ছেলেমানুষী) হিংসাটুকু গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায় পালটে গেছে। আমি বুঝতে শিখেছি দেশের জন্যে যুদ্ধ করার সেই অবিশ্বাস্য গৌরব সবার জন্যে নয়, সৃষ্টিকর্তা অনেক যত্ন করে সৌভাগ্যবান কিছু মানুষকে তার জন্যে বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিক হবে, ফিল্ড মেডেল বিজয়ী গণিতবিদ হবে, অস্কার বিজয়ী চিত্র পরিচালক হবে, অলিম্পিকে স্বর্ণ বিজয়ী দৌড়বিদ হবে, ওয়ার্ল্ডকাপ বিজয়ী ক্রিকেট টিম হবে এমনকী মহাকাশ বিজয়ী মহাকাশচারী হবে কিন্তু আর কখনোই মুক্তিযোদ্ধা হবে না! এই সম্মানটুকু সৃষ্টিকর্তা যাদের জন্যে আলাদা করে রেখেছেন শুধু তারাই তার প্রাপ্য, অন্যেরা নয়। (তাই আমি যখন দেখি অল্প কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধার ভূয়া সনদ বের করে ফেলছে তখন আমার মনে হয় গলায় আঙুল ঢুকিয়ে তাদের উপর হড় হড় করে বমি করে দিই!) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার ভেতরে এখন গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। আমি সবসময়ে চেষ্টা করে এসেছি নূতন প্রজন্মের ভেতর সেই অনুভূতিটুকু সঞ্চারিত করতে, যেভাবে সম্ভব মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু পৌঁছে দিতে। একটি সময় ছিল যখন এই দেশে রাজাকারদের গাড়ীতে জাতীয় পতাকা উড়তো , মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করে দেখানো হত, মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করা হত - তখন এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বুকের ভেতর যে গভীর অভিমান জমা হয়েছিল আমি সেই কথা কখনো ভুলতে পারব না। আমাদের খুব সৌভাগ্য আমরা সেই সময়টি পিছনে ফেলে এসেছি। এই দেশের মাটিতে আমরা আর কখনো কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে অবমাননা করতে চাই না।

তাই যখন আমি আবিষ্কার করেছি একটি বইয়ের বিষয়বস্তুর কারনে এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারকে অপমান করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে আহত করেছে। এ কে খন্দকার শুধু একজন মুক্তিযোদ্ধা নন তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ। ষোলই ডিসেম্বর যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ করে তখন তিনি আমাদের বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টা তিনি এবং তার সহযোদ্ধারা মিলে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম তৈরি করে নূতনভাবে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন এবং আমাদের তরুণেরা সেটা সাগ্রহে গ্রহণ করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্যে ভালোবাসা এদেশে আবার নূতন করে প্লাবিত হয়েছে। এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের মানুষকে সংগঠিত করেছেন। মনে আছে তিনি এবং তার সহযোদ্ধারা একবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন এবং এয়ারপোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পর্যন্ত পথটুকু আমি গাড়িতে তার পাশে বসে এসেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের এরকম একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পাশে বসে আছি চিন্তা করেই আমি শিহরিত হয়েছিলাম। তিনি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেছিলেন, তাদের অনুপ্রাণীত করে ছিলেন।

আমরা তাদের নিয়ে আমাদের একটা খোলা চত্বরে তাদের হাতে কিছু গাছ লাগিয়েছিলাম, এতোদিনে গাছগুলো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি নিয়ে অনেক বড় হয়েছে, আমরা সেই চত্বরটিকে সেক্টর কমান্ডারস চত্বর বলে ডাকি।

সে কারণে যখন আমি দেখি এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারকে তীব্র ভাষায় শুধু সমালোচনা নয় অপমান করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন সেটি আমাকে তীব্রভাবে আহত করে। যারা তাঁকে নানাভাবে অপমান করার চেষ্টা করছেন তারা কী বুঝতে পারছেন না এভাবে আসলে আমরা শুধু আমাদের নিজেদেরকেই না আমরা মুক্তিযুদ্ধকেও অপমান করছি? তাঁর অবদানকে খাটো করে দেখার চেষ্টা করছি? খবরের কাগজে দেখেছি বার্ধক্যের কথা বলে তিনি সেক্টরস কমান্ডারস ফোরামের নেতৃত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, কাউকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না তাঁকে নিয়ে তীব্র সমালোচনা, বিতর্ক এবং অপমানই হচ্ছে মূল কারণ। আমরা আমাদের দেশে একজন মানুষকে তার নিজের মত প্রকাশের জন্যে এভাবে অসম্মান করব আমি সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

২.

এটি অবশ্যি কেউ অস্বীকার করবে না যে এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের বইটি পড়ে আমাদের সবারই কম বেশী মন খারাপ হয়েছে। আমরা সবাই আশা করে ছিলাম তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখবেন, সেটি ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি যেটুকু নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তার থেকে বেশী ইতিহাসকে নিজের মত করে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন সৈনিক, তার বিশ্লেষণ হয়েছে সৈনিকের চোখে, ইতিহাসবিদ, সাধারণ মানুষ কিংবা রাজনৈতিক মানুষের সাথে তার বিশ্লেষণ মিলবে তার গ্যারান্টি কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা এই বইয়ে তিনি যা লিখেছেন সেখানে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথাগুলো ছাড়া অন্য সব কথাই কিন্তু আমরা সবাই অন্য জায়গায় শুনেছি! আমার দুঃখ হয় অন্য মানুষের মুখে আগে শুনে থাকা কথাগুলোর জন্যে আজকে তাঁর মতো একজন মানুষকে এতো অসম্মান করা হলো।

আমি মোটেই বইটি নিয়ে আলোচনা করবনা, শুধু বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় নিয়ে কথা বলব। এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার লিখেছেন ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষনটি শেষ করেছেন “জয় পাকিস্তান” বলে। হুবহু এই বিষয়টি লিখেছিলেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান তাঁর “বাংলাদেশের তারিখ” বইটিতে। তিনি অবশ্যি “জয় পাকিস্তান” লিখেননি তিনি লিখেছিলেন “জিয়ে পাকিস্তান”।

পরবর্তী কোনো একটি সংস্করণের তিনি বই থেকে এই কথাটি সরিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ধরে নিচ্ছি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই তথ্যটি ভুল ছিল, তিনি ভুল সংশোধন করেছেন। এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার যেহেতু দাবী করেন নি তিনি নিজের কানে বঙ্গবন্ধুকে জয় পাকিস্তান বলতে শুনেছেন তাই আমি ধরে নিচ্ছি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, যেখান থেকে এই তথ্যটি পেয়েছেন তিনিও সম্ভবতঃ একই জায়গায় সেটি পেয়েছেন। এই বিচিত্র তথ্য সূত্রটি কী ? আমার মনে হয় এর সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যখ্যা দিয়েছেন সৈয়দ বদরুল আহসান ডেইলী স্টার পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণটি যখন পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচার করা হয় তখন স্থানীয় পত্রিকাগুলো তাদের দেশের মানুষ যেন বিচলিত না হয় সেজন্যে বক্তৃতার শেষে এই কথাটুকু জুড়ে দিয়েছিল। সেই কথাটিই এখনো নানা জনের কথায় চলে এসেছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে। তিনি লিখেছেন তাজউদ্দীন আহমদের অনুরোধের পরও তিনি একটি স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে রাজী হন নি। আমি ইতিহাসবিদ নই, আমি নির্মোহ ভাবে চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু আমার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আগ্রহ আছে, ছোটদের জন্যে ২২ পৃষ্ঠার একটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার জন্যে আমাকে অনেক বই পড়তে হয়েছিল! আমি পাকিস্তানী মিলিটারী অফিসার সিদ্দিক মালিকের বইয়ে দেখেছি তিনি লিখেছেন পঁচিশে মার্চ রাতে খুবই ক্ষীনভাবে একটি স্বাধীণতার ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল। ঘোষণাটি কোথা থেকে এসেছিল তার একটি ব্যাখ্যা তাজউদ্দীন আহমদের বড় মেয়ে শারমিন আহমেদের বইটিতে (তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭) দেয়া আছে। ট্রান্সমিটার বানানোতে পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হোক ঘোষণাটি প্রচার করেছিলেন বলেই হয়তো পাকিস্তান মিলিটারীর হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

যাই হোক, আমি আগেই বলেছি আমি আসলে এই বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে বসিনি, অনেকেই সেটা লিখেছেন। সবচেয়ে বড় কথা একাত্তরে বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু সমার্থক দুটি শব্দ ছিল, এতদিন পর দুটি শব্দকে আলাদা করে দেখার সুযোগ কোথায় ? বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে কী বাংলাদেশের জন্ম হত ?

৩.

আগেই বলেছি এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের বইটি পড়ে আমার একটু মন খারাপ হয়েছে। শুধু আমার নয় - আমার মত অনেকেরই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের মত যে সব মানুষের এক ধরনের ছেলেমানুষী উচ্ছাস রয়েছে তারা সবচেয়ে বেশী মনে কষ্ট পেয়েছে। তবে আমার ধারনা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের, যে ভাষায় এবং যে প্রক্রিয়ায় তাঁকে অসম্মান করা হয়েছে সেটা মেনে নেয়া কঠিন।

আমার ধারণা তিনি নিজেও নিশ্চয়ই ভাবছেন, যে কথাগুলো ইতিহাসের সত্য বলে প্রকাশ করতে চাইছি সেই কথাগুলো তো বঙ্গবন্ধুকে খাটো করে দেখানোর জন্যে আরো অনেকেই আগে এভাবে বলেছে - তাহলে এই বইয়ে সেটি লিখে কার লাভ হলো ?

আমিও ভাবছিলাম কার লাভ হলো ? তখন হঠাৎ করে উপলব্ধি করেছি যে লাভ হয়েছে বইয়ের প্রকাশকের ! বইটি প্রকাশ করেছে প্রথম আলোর প্রকাশনা সংস্থা এবং তারা একটু পরে পরে বইটির বিজ্ঞাপন দিয়ে বইটি বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। খুবই স্থুল ভাবে বলা যায় একটি করে করে বই বিক্রি হচ্ছে, একজন সেই বই কিনছে, সেই বই পড়ছে আর মন খারাপ করছে আর প্রথমা প্রকাশনীর ক্যাশ বাক্সে একটু করে অর্থ যুক্ত হচ্ছে। আমি যদি একজন প্রকাশক হতাম তাহলে কী শুধু মাত্র কিছু অর্থ উপার্জন করার জন্যে এরকম একটি বই প্রকাশ করে এই দেশের সবচেয়ে সম্মানী মানুষটিকে এরকম অসম্মানের দিকে ঠেলে দিতাম ? কিছুতেই দিতাম না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে একটা কথা আছে, মাওলানা আবুল কালাম আজাদও তার মত প্রকাশ করার জন্যে "ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম" নামে একটা বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের সংক্ষিপ্ত একটা রুপ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পুরো বইটি পড়ে অনেকে মনে কষ্ট পেতে পারে বলে তিনি বলেছিলেন তার মৃত্যুর ৫০ বছর পরে যেন পুরো বইটি প্রকাশ করা হয়। তার মৃত্যুর ৫০ বছর পরে আমরা সেই বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। কাজেই ইতিহাসে সত্য যুক্ত করার জন্যে সময় নেয়ার উদাহরণ পৃথিবীতে আছে - একজন মানুষকে অসম্মান করা হবে জানলে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। দ্রুত অর্থ উপার্জন পৃথিবীর একমাত্র পথ নয়।

বইটি পড়ে আমার ভেতরে একধরনের অস্বস্তি খচখচ করছিল, বারবার মনে হচ্ছিল, সত্যিই কী বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে খন্দকার এই বইটি নিজের হাতে কাগজের উপর কলম ঘষে ঘষে লিখেছেন ? আমার কৌতুহলটি মেটানোর জন্যে আমি প্রথম আলোর প্রকাশনা সংস্থা "প্রথমা" কে ফোন করলাম, তাদের কাছে অনুরোধ করলাম তার হাতে লেখা পান্ডুলিপিটি কী আমি এক নজর দেখতে পারি ? তারা একটু ইতস্তত করে আমাকে জানালেন, সেভাবে হাতে লেখা পুরো পান্ডুলিপি তাদের কাছে নেই। কিছু আছে। তবে তার সাথে আলাপ আলোচনা করেই পুরোটা প্রস্তুত করা আছে এবং এই বইয়ের পুরো বিষয়বস্তুর সাথে তিনি পুরোপুরি একমত সেরকম সাক্ষ্য প্রমাণ তাদের কাছে আছে।

আমি লেখা লেখি করি তাই এই উত্তর শুনে আমি কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। আমার মনে হতে লাগল এই বইটি কেমন করে লেখা হয়েছে কিংবা "প্রস্তুত" করা হয়েছে সেটা খুব কৌতুহল উদ্দীপক একটা বিষয় হতে পারে। বই লেখা আর বই প্রস্তুত করার মাঝে অনেক বড় পার্থক্য। আমরা কি প্রথমা প্রকাশনীর কাছ থেকে এই বই প্রস্তুত করা সংক্রান্ত একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেতে পারি ? আমাদের মনের শান্তনার জন্যে ?

৪.

আমরা সবাই জানি এই বইটি লেখার জন্যে এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকারকে সম্ভবত তার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের নেতৃত্ব দেবেন না আমি সেটা কল্পনাও করতে পারি না। তার বই পোড়ানো হয়েছে, খন্দকার মুশতাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে - ব্যক্তিগত পর্যায়ে কী বলা হচ্ছে সেগুলোর কথা তো ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সবার কাছে আমার খুব সোজা একটি প্রশ্ন। এই বইটি লেখার দায়ভার কী শুধু লেখকের ? প্রকাশককেও কী খানিকটা দায়ভার নিতে হবে না ? আপত্তিকর কিংবা বিতর্কিত কিছু লিখে একজন লেখক সমালোচনা আর অসম্মান সহ্য করবেন এবং সেই সমালোচনা আর অসম্মান বিক্রি করে প্রকাশক অর্থ উপার্জন করবেন সেটি কেমন কথা ? আমরা কী কোনভাবে প্রকাশককেও দায়ী করতে পারি ?

হুবহু এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশে এর একটি “ক্লাসিক” উদাহরণ আছে এবং আমাদের অনেকেরই নিশ্চয় ঘটনাটি মনে আছে। ২০০৭ সালে প্রথম আলোর রম্য সাপ্তাহিকী আলপিনে একটা অত্যন্ত নিরীহ কার্টুন ছাপা হয়েছিল। এই দেশের ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সেই নিরীহ কার্টুনটিকে একটা ইসলাম বিরোধী রুপ দিয়ে হাঙ্গামা শুরু করে দেয় এবং আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কার্টুনিষ্টকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হল। শুধু তাই নয় এটা প্রকাশ করার অপরাধে আলপিনের সম্পাদক সুমন্ত আসলামকে বরখাস্ত করা হল। এখানেই শেষ নয়, আমরা দেখলাম প্রথম আলোর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে পরিচিত বায়তুল মোকাররমের খতিবের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। (আমার ধারণা ছিল সংবাদপত্র আদর্শ এবং নীতির কাছে কখনো মাথা নত করে না, সেদিন আমার সেই ধারনাটিতে চোট খেয়েছিলো!) এই অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং নাটকীয় ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম কোনো কিছু বিতর্কিত বা আপত্তিকর ছাপানো হলে লেখকের সাথে সাথে প্রকাশকদেরও সেই দায়ভার গ্রহন করেত হয়। আগে গ্রহন করেছে।

আমার খুব ইচ্ছে আমাদের সবার কাছে সম্মানীত বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে খন্দকারের বক্তব্যের দায়ভার প্রকাশক খানিকটা হলেও গ্রহন করে তাঁকে যেন তার সম্মানটুকু ফিরিয়ে দেয়।

আমাদের ছেলেমেয়েদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এবং অপমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল নিয়ে দেশে তুলকালাম হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সারাদেশে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হওয়ার মতো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দুইজনের বেশি নেই। বিষয়টি সংবাদপত্র খুব ফলাও করে প্রচার করেছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অনেক বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি একমত নই; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ার মতো যোগ্যতা ১৬ কোটি মানুষের দেশে বলতে গেলে কারোই নেই, এ ব্যাপারটিতে তিনি যা বলেছেন আমি মোটামুটিভাবে তার সঙ্গে একমত। আমি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখিনি, ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য কী কী যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে, তার খুঁটিনাটিও জানি না। কিন্তু শুধু কমনসেন্স ব্যবহার করে খুব জোর গলায় বলতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পড়ার যোগ্যতা এ দেশে অনেক ছেলেমেয়েরই আছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের অসংখ্য ছেলেমেয়ে পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো বিভাগে পড়ার মতো যোগ্যতা রাখে। আমি যদি তাদের খুঁজে বের করতে না পারি, তাহলে তার দায় দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদের নয়, শিক্ষা ব্যবস্থারও নয়, তার দায় দায়িত্ব যারা খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের। আমরা সবাই জানি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তার ভেতরে থেকেও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী নিজের আগ্রহ নিয়ে লেখাপড়া করে, হাজার প্রতিবন্ধকতা দিয়েও তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাই আমি যখন পত্রপত্রিকায় দেখি, সারা বাংলাদেশে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিভাগে ভর্তি হওয়ার মতো ছাত্রছাত্রী দুইজনের বেশি নেই, আমি অত্যন্ত বিচলিত হই। আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের সারাদেশের সামনে হেয় করার এই দায়িত্বহীন প্রচারণা দেখে আমি ব্যথিত হই।

আমি মনে করি পুরো বিষয়টি ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করার জন্য হাইকোর্ট থেকে একবার আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল - আমি তখন তাদের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি সেবার ভয়ংকর এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রতিটি কোনো না কোনো গাইডবই থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার কাজটি সহজ নয়। মান যাচাই করার পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন হয় এক রকম - ভর্তি পরীক্ষার জন্য ছেঁকে নেওয়ার প্রশ্ন হয় সম্পূর্ণ অন্যরকম। ছেঁকে নেওয়ার প্রশ্ন দিয়ে মান যাচাই করার চেষ্টা করা কোনোভাবেই সঠিক নয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে যত খুশি সমালোচনা করা যেতে পারে কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের দক্ষতা নিয়ে বা মান নিয়ে সমালোচনা করলে সতর্কভাবে করতে হবে। তাদের দায়িত্বহীনের মতো হতাশার পথে ঠেলে দেওয়া যাবে না। আমরা যারা পড়াই, প্রশ্ন করি, পরীক্ষা নিই - সবাই জানি ইচ্ছা করলেই এমনভাবে প্রশ্ন করা সম্ভব ছাত্রছাত্রীরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীদের আটকানো যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় কাজটি পানির মত সহজ। আমরা কি সেটাই করতে চাই ?

আমরা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান নিয়ে এত বড় বড় কথা বলি, সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান কোথায় সেটি নিয়ে যদি উল্টো ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করে বসে, আমরা কি তার উত্তর দিতে পারব ? আমরা তখন কোথায় গিয়ে আমাদের মুখ লুকাবো ?

ভর্তি পরীক্ষার এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে আমার ভেতরে খুব আগ্রহ কি সম্মানবোধ কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। সংবাদপত্রগুলোকে আমি বহুদিন থেকে অনুরোধ করে আসছি, তারা যেন একবার এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় (কিংবা ভর্তি বাণিজ্য যেটাই বলি) ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কত টাকা আদায় করা হয়, তার ভেতর থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য নানা কাজে কত টাকা খরচ হয় এবং কত টাকা সম্মানী হিসেবে শিক্ষকরা ভাগাভাগি করে নেন, তার একটা তালিকা প্রকাশ করেন, তাহলে ভর্তি পরীক্ষা নামের এই ভয়ংকর অমানবিক এবং চূড়ান্ত অস্বচ্ছ বিষয়টি সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে সম্মিলিতভাবে একটা ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার কথা বহুদিন থেকে আলোচিত হয়ে আসছে। প্রকাশ্যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তার বিরোধিতা করে না কিন্তু ঠিক সময়টিতে কেউ তার উদ্যোগ নেয় না। আমাদের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে গত বছর একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, যুব ইউনিয়ন, জাসদ এ রকম বামপন্থি দলগুলো তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেটি বিএনপি-জামায়াতের হাতে তুলে দেয় (যারা এই বাক্যটি পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন তাদের ঠাণ্ডা মাথায় আরও একবার বাক্যটি পড়ার অনুরোধ করছি)। পরীক্ষার দিন হরতাল ডাকা হবে এ রকম হুমকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দেওয়া হয়!

রাজনৈতিক দলগুলো যাই ভাবুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভর্তি প্রক্রিয়ায় যত টাকাই উপার্জন করেন না কেন, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের নিয়ে যতই অহংকার করুক না কেন আমি মনে করি সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটি সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া হচ্ছে এই দেশের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার নামে অমানবিক যন্ত্রণা (এবং নূতন যোগ হওয়া অপমান) বন্ধ করার একমাত্র উপায়। এ ধরনের একটি প্রক্রিয়া কাজ করানোর জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তার প্রত্যেকটা ধাপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে এবং কাজে লাগানো হয়েছে। প্রযুক্তিগত প্রত্যেকটা বিষয় সমাধান করা হয়েছে (অর্থ উপার্জন কমে যাবে বলে যারা বলেন এটা করা সম্ভব না, তাদেরকেও ভরসা দিয়ে বলা যায় তারা এই নূতন পদ্ধতিতেও যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পারবেন!)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত, তাই তারা কারও কথা শুনতে বাধ্য নয় - এতোদিনে আমি টের পেয়ে গেছি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনোই নিজে থেকে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসবে না!

আমার জানামতে এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদেরকে ডেকে একটি নির্দেশ দেন যে সামনের বছর থেকে সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিতে হবে, তাহলেই সেটি সম্ভব। তা না হলে সম্ভব নয়, ছাত্রছাত্রীদের বছরের পর বছর যন্ত্রণা কষ্ট আর অপমান সহ্য করে যেতে হবে।

আমাদের ভাইস চ্যান্সেলররা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে মানেন না, শিক্ষামন্ত্রীর কথা শুনতে রাজি নন, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবাধ্য হওয়ার সাহস মনে হয় তাদের কারোরই হবে না।

একজন সাধাসিধে মা

১.

আমার মা সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখ খুব ভোর বেলা মারা গেছেন। আমার বাবা যখন মারা গেছেন তখন তার কাছে কোনো আপনজন ছিলো না, একটা নদীর তীরে জেটিতে দাড়া করিয়ে পাকিস্তান মিলিটারী গুলি করে তাকে হত্যা করে তাঁর দেহটা নদীতে ফেলে দিয়েছিল। আমার মা যখন মারা যান তখন তার সব আপনজন - ছেলে মেয়ে ভাই বোন নাতি নাত্নীরা সবাই তার পাশে ছিল। আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার মায়ের বয়স মাত্র ৪১, তারপর আমার মা তার সন্তানদের এবং তার আপনজনদের জন্যে আরো ৪৩ বছর বেঁচে ছিলেন।

আমার মায়ের মৃত্যুটি একান্তভাবেই একটি পারিবারিক ঘটনা হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু আমি এক ধরণের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করেছি তার অসুস্থতার খবরটিও পত্রপত্রিকা এবং টেলিভিশনে প্রচার হয়েছে। তার মৃত্যুর খবরটি সব পত্রপত্রিকায় খুব গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। যদি খবরের শিরোনাম হতো, “হুমায়ূন আহমেদের মায়ের জীবনাবসান”, আমি সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে ধরে নিতাম। কিন্তু আমি খুব অবাক হয়েছি যখন দেখেছি আমার মা’কে তার নিজের নামে পরিচয় দিয়ে লিখেছে, “আয়েশা ফয়েজের জীবনাবসান”। আমি জানতাম না এই দেশের মানুষ আমার মা’কে তার নিজের নামে চেনে। সেজন্যে আমি আজকে এই লেখাটি লিখতে বসেছি - মনে হয়েছে যদি সত্যিই দেশের মানুষ তাকে তাঁর পরিচয় দিয়েই চেনে তাহলে হয়তো অনেকেই আমার একেবারে সাদাসিধে মায়ের জীবনের একটি দুটি ঘটনা শুনতে আপত্তি করবেন না।

মাঝে মাঝেই আমাকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন, “আপনি আমেরিকার এতো সুন্দর জীবন ছেড়ে দেশে কেন চলে এলেন?” নানাভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। নিজের দেশে ফিরে আসতে যে কোনো কারণ লাগে না - বরং উল্টোটাই সত্যি, দেশ ত্যাগী হওয়ার পিছনে ভালো কারন থাকা দরকার সেটা কাকে বোঝাব? প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম তখন ই-মেইল ইন্টারনেট আবিষ্কার হয়নি, ডজন হিসেবে টিভি চ্যানেল ছিলো না, টেলিফোন অনেক মূল্যবান বিষয় ছিল, মায়ের ফোন ছিল না থাকলেও আমার তাকে নিয়মিত ফোন করার সামর্থ্য ছিল না। যোগাযোগ ছিলো চিঠিতে - চিঠি লিখলে সেটা দেশে আসতে লাগতো দশ দিন, উত্তর আসতে লাগতো আরো দশ দিন। মেল বক্সে দেশ থেকে আসা একটা চিঠি যে কী অবিশ্বাস্য আনন্দের বিষয় ছিল সেটা এখন কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

সেই সময়ে আমার মা আমাকে প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতেন। আমি জানি এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে আমি আমার আঠারো বছরের প্রবাস জীবনে প্রতি সপ্তাহে আমার মায়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। আমার মা তার গুটি গুটি হাতের লেখায় প্রতি সপ্তাহে আমাকে বাসার খবর দিয়েছেন, ভাইবোনদের খবর দিয়েছেন, আত্নীয়স্বজনদের খবর দিয়েছেন, এমন কী দেশের খবরও দিয়েছেন। আমার প্রবাস জীবনে দেশ কখনো আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারেনি শুধুমাত্র আমার মায়ের চিঠির কারনে। কয়েক বছর পর বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদও পি.এইচ.ডি. করতে আমেরিকা এসেছিল, তখন আমার মা প্রতি সপ্তাহে দুটি চিঠি লিখতেন - একটি আমাকে আরেকটি আমার ভাইকে। আমার মায়ের লেখা সেই চিঠিগুলো বাঁচিয়ে রাখিনি - এখন চিন্তা করে খুব দুঃখ হয়। যদি চিঠিগুলো থাকতো তাহলে সেটি কী অসাধারণ দলীল হতো আমি সেটি চিন্তাও করতে পারি না।

আমার মা খুবই সাধারণ একজন সাদাসিধে মহিলা ছিলেন - অন্তত আমরা সবাই তাই জানতাম। দেশ স্বাধীন হবার পর যখন আমাদের থাকার জায়গা নেই, ঘুমানোর বিছানা নেই, পরনের কাপড় নেই, তখন হঠাৎ করে আমরা সবাই আমার মায়ের একটা সংগ্রামী নূতন রুপ আবিষ্কার করলাম। আমরা ভাইবোনেরা সবাই লেখাপড়া করছি - কিছুতেই লেখাপড়া বন্ধ করা যাবে না তাই বাবার গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স আর পেনশনের অল্প কিছু টাকার উপর ভরসা করে ঢাকায় স্থায়ী হলেন। কী ভয়ংকর সেই সময়, এখন চিন্তা করলেও আমার ভয় হয়! বাড়তি কিছু টাকা উপার্জনের জন্যে আমার মা একটা সেলাই মেশিন জোগাড় করে কাপড় সেলাই পর্যন্ত করেছেন। আমি পত্রিকায় কার্টুন আঁকি - গোপনে প্রাইভেট টিউশনি করি, এভাবে কোনোমতে টিকে আছি। বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ পাশ করে একটা চাকরী পাবে সবাই সেই আশায় আছি। এরকম সময় আমি একদিন হঠাৎ করে বলাকা সিনেমা হলের নিচে একটা বইয়ের দোকানে পুরো মানিক গ্রন্থাবলী আবিষ্কার করলাম। পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা অপূর্ব প্রচ্ছদ, পুরো সেটের দাম তিনশ টাকা! (এখনকার টাকায় সেটি নিশ্চয়ই দশ বারো হাজার টাকার সমান হবে!) এতো টাকা আমি তখনো একসাথে হয়তো ছুয়েও দেখিনি। এই বইয়ের সেট আমার ধরা ছোয়ার বাইরে। তবু আমি বইগুলো হাত বুলিয়ে দেখি, লোভে আমার জিভে পানি এসে যায়।

যাই হোক বিকালবেলা বাসায় ফিরে এসেছি, ভাইবোনদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমি তখন মানিক গ্রন্থাবলীর সেটটার কথাই শুধু ঘুরে ফিরে বলছি, কী অপূর্ব সেই বইগুলো, দেখে কেমন লোভ হয় কিছুই বলতে বাকী রাখি নি।
আমার মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, “কতো দাম ?”
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, “তিনশ টাকা।”
আমার মা বললেন, “আমি তোকে তিনশ টাকা দিচ্ছি, তুই কিনে নিয়ে আয়।”

আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমাদের পরিবারের তখন যে অবস্থা তখন প্রত্যেকটি পয়সা গুনে গুনে খরচ করা হয়। তার মাঝে আমার মা আমাকে তিনশ টাকা দিয়ে দিচ্ছেন এরকম ভয়ংকর একটা বিলাসিতার জন্যে ? "মানিক গ্রন্থাবলী" কিনে আনার জন্যে ? টাকাটা কোথা থেকে দিচ্ছেন, এই টাকা দিয়ে বই কিনে ফেলার পর সংসারের কোন চাকাটা অচল হয়ে পড়বে আমার সেইসব জিজ্ঞেস করা উচিৎ ছিলো ! আমি তার কিছুই করিনি। মায়ের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে সেই বইয়ের দোকানে হাজির হলাম, ভয়ে বুক ধুকধুক করছে, এর মাঝে যদি কেউ সেই বইগুলো কিনে নিয়ে যায় তাহলে কী হবে ? বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখলাম বইগুলো তখনো আছে। আমি টাকা দিয়ে লোভীর মতো মানিক গ্রন্থাবলীর পুরো সেট ঘাড়ে তুলে নিলাম। আহা কী আনন্দ!

বাসার সবাই বই পড়ে, তাই সেই আনন্দ শুধু আমার একার নয়, সবার। কেউ তখন বাসায় এলে বিচিত্র একটা দৃশ্য আবিষ্কার করতো, ঘরের একেক কোনায় একেকজন বসে, শুয়ে, আধাশোয়া হয়ে, কাত হয়ে, সোজা হয়ে মানিক গ্রন্থাবলী পড়ছে!

তারপর বড় হয়েছি, জীবনে বেঁচে থাকলে অনেক কিছু কিনতে হয়, অন্য অনেকের মতো আমিও কিনেছি। আমেরিকা থাকতে শো রুম থেকে নূতন গাড়ী কিনে ড্রাইভ করে বাসায় এসেছি, ঝকঝকে নূতন বাড়ীও কিনেছি - কিন্তু সেই মানিক গ্রন্থাবলী কেনার মত আনন্দ আর কখনো পাইনি, আমি জানি কখনো পাব না। এটি আমার জীবনের ঘটনা, যারা আমার মায়ের কাছাকাছি এসেছে তাদের সবার জীবনে এরকম ঘটনা আছে। কাউকে কিছু কিনে দিয়েছেন, কাউকে অর্থ সাহায্য করেছেন, কাউকে চিকিৎসা করিয়েছেন, কাউকে উপহার দিয়ে অবাক করে দিয়েছেন কিংবা কাউকে শুধু আদর করেছেন, দুঃখের সময় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন।

আমরা যখন আমেরিকা থাকি তখন একবার তাঁকে আমাদের কাছে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। আমেরিকা দেখে আমার মা খুবই অবাক, তাঁর শুধু একটাই প্রশ্ন, "মানুষ জন কোথায় গেল ?" আমরা তাঁকে বোঝাই, মানুষ জন কোথাও যায়নি - যাদের দেখছেন তারাই আমেরিকার মানুষ ! আমরা যখন বাসায় থাকি না তখন মাঝে মাঝে আমার মা হাঁটতে বের হন, রাস্তা ধরে এদিক সেদিক হেঁটে আসেন। একদিন হেঁটে এসে আমাদের বললেন, "তোরা কখনো বলিস নি, এখানে একটা কবরস্থান আছে। কী সুন্দর কবরস্থান, কবরের উপর কতো ফুল। আমি সেই কবরগুলো জেয়ারত করে এসেছি।"
আমি মাথায় হাত দিয়ে বললাম, "হায় হায় ! আপনি জানেন কী করেছেন ?"
মা বললেন, "কী করেছি ?"
আমি বললাম, "ওটা কুকুর বেড়ালের কবর। আপনি কুকুর বেড়ালের কবর জেয়ারত করে ফেলেছেন!"
এই দেশে কবরস্থানে কুকুর, বেড়ালকে কবর দেয়া হয়, শুনে মা চোখ লপালে তুললেন আর আমরা হেসে কুটি কুটি হলাম।

দেশে থাকতে মা কতো রকম কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকেন, আমেরিকায় তার কোনো কাজ কর্ম নেই। আমার ছেলে মেয়েরা ছোট তাদের বাংলা পড়তে শেখান। তখন নূতন পার্সোনাল কম্পিউটার বের হয়েছে, বাসায় একটা আছে, আমি সেখানে বাংলায় লেখার ব্যবস্থা করেছি। একদিন মা'কে বাংলা লেখা শিখিয়ে দিলাম। আমার মা তখন কম্পিউটারে বাংলায় দেশে ছেলে মেয়ে নাতী নাত্নীর কাছে চিঠি লিখতে শুরু করলেন। কম্পিউটারে বাংলায় লেখা মায়ের চিঠি দেখে দেশে সবাই হতবাক হয়ে গেল!

এতো কিছু করেও মায়ের অনেক অবসর। আমার স্ত্রী তখন মা'কে বলল, "আপনার এতো ঘটনাবহুল একটা জীবন, আপনি বসে বসে সেই জীবনীটুকু লিখে ফেলেন না কেন ?" আমার মা একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত লিখতে রাজী হলেন। তারপর বসে বসে তাঁর বৈচিত্রময় জীবনীটুকু লিখে ফেলেন, আমি কম্পিউটারে সেটা টাইপ করে দিলাম। মা দেশে যাবার সময় তার হাতে পুরো পান্ডুলিপিটা দিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করলেই কোনো প্রকাশককে দিয়ে সেটা প্রকাশ করানো যেতো কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সেটা দেশে বাক্সবন্দী হয়ে থাকল। আমরা আমার মায়ের লেখা আত্মজীবনীর কথা ভুলেই গেলাম। তারপর বহুদিন কেটে গেছে, আমি দেশে ফিরে এসেছি তখন হঠাৎ করে উইয়ে কাটা অবস্থায় এই পান্ডুলিপি নূতন করে আবিষ্কৃত হল, আমি তখন উদ্যোগ নিয়ে সময় প্রকাশনীকে সেটি দিয়েছি ছাপানোর জন্যে। তারা খুব আগ্রহ নিয়ে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে নিল। যখন বইয়ের ছাপা শেষ, বাঁধাই হচ্ছে তখন হঠাৎ করে আমার মায়ের খুব শরীর খারাপ। কী কারণে তার ধারণা হল তিনি বুঝি আর বাঁচবেন না, আমি তখন সিলেটে, আমাকে ফোন করে বললেন, "বাবা, যদি তোদের সাথে কখনো ভুল করে থাকি, মনে কষ্ট রাখিস না। আমাকে মাফ করে দিস।"

শুনে আমার মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা, মা'কে মাফ করে দেবো মানে ? আমি তখনই সময় প্রকাশনীর সত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদকে ফোন করে জিগ্যেস করলাম আমার মায়ের বইয়ের কি অবস্থা। ফরিদ জানালেন বই বাঁধাই হচ্ছে। আমি বললাম এই মুহুর্তে দুটি বই বাঁধাই করে আমার মার হাতে দিয়ে আসতে হবে। আমি জানি একজন লেখকের জীবনের প্রথম বইয়ের থেকে বড় আনন্দ পৃথিবীতে নেই। ফরিদ ছুটতে ছুটতে বই নিয়ে আমার মায়ের হাতে তুলে দিল এবং সাথে সাথে মায়ের সব অসুস্থতা দূর হয়ে গেল ! আমার মা পুরোপুরি ভালো হয়ে গেলেন। শুধু ডাক্তাররা চিকিৎসা করে কে বলেছে, আমিও চিকিৎসা করতে পারি। আমার মা খুবই আন্তরিকভাবে এই বইটি লিখেছিলেন, যারাই বইটি পড়েছে তাদের সবার হৃদয় স্পর্শ করেছে। একজন মানুষ জীবনে কতোভাবে কষ্ট পেতে পারে, এই বইটি পড়লে সেটি বোঝা যায়। হুমায়ূন আহমেদ মারা যাবার পর আমার মা আবার নতুন করে যে কষ্ট পেয়েছিলেন সেই কষ্ট থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন আমরা কেউ ভাবিনি। সেই কষ্ট ভুলে থাকার জন্যে আমার মা বসে বসে তার কাছে চিঠি লেখার মত করে অনেক কিছু লিখেছেন। পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে আছে, হয়তো এটাও কোনো প্রকাশককে দিয়ে কখনো প্রকাশ করিয়ে দেব।

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুটি আমার মা'কে খুব বড় একটা আঘাত দিয়েছে, সত্যিকারভাবে আমার মা কখনোই সেই আঘাত থেকে বের হতে পারেননি। আমরা টের পেতাম তার মনটি ভেঙে গেছে, একজনের মন ভেঙে গেলে তাকে জোর করে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আমরাও পারিনি, গত ২৭ তারিখ আমার মা তার বড় ছেলে হুমায়ূন আহমেদের কাছে চলে গেছেন। সে সম্ভবত আমার বাবাকে নিয়ে আমার মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারা তখন একজন আরেকজনকে কী বলেছিল আমার খুব জানার কৌতূহল হয়।

২.

খবরের কাগজে আমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ ছাপানোর সময় অনেকেই তাকে রত্নগর্ভা বলে সম্বোধন করেছে। এই বিশেষণটি পড়ে আমি দুই কারণে একটু অস্বস্তি বোধ করেছি।
এক: এটি সত্যি হলে আমাদের ভাইবোনের সবারই ছোটবড় মাঝারি রত্ন হয়ে ওঠার একটা চাপ থাকে, কাজটি সহজ নয় !
দুই: এই বিশেষণটি সত্যি হলে বোঝানো হয় আমার মায়ের নিজের কোনো অবদান নেই, তার একমাত্র অবদান হচ্ছে তিনি ছোট-বড়-মাঝারি 'রত্ন' জন্ম দিয়েছেন !

কিন্তু আমি জানি রত্নগর্ভা হিসেবে নয়, আসলে আমার মা একজন খুব সাদাসিধে মা হিসেবেই অনেক বড় অবদান রেখেছেন। আমার মা যেভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে আমাদের পুরো পরিবারটিকে রক্ষা করেছেন তার কোনো তুলনা নেই। যদি বুক আগলে আমাদের রক্ষা না করতেন তাহলে আমরা কেউই টিকে থাকতে পারতাম না।

কীভাবে কীভাবে জানি আমার মায়ের একটা পরিচিতি হয়েছে, তিনি অসুস্থ হলে টেলিভিশনে খবর প্রচারিত হয়, তিনি মারা গেলে খবরের কাগজে কালো বর্ডার দিয়ে খবর ছাপা হয়। কিন্তু আমি আমার মা'কে দেখে বুঝেছি এই বাংলাদেশে নিশ্চয়ই আমার মায়ের মত অসংখ্য মা আছেন যারা যুদ্ধে স্বামীকে হারিয়েছিলেন এবং যারা নিজের সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ঠিক আমার মায়ের মত সংগ্রাম করেছিলেন। তাদের কথা কেউ জানে না, তাদের কথা কেউ বলে না।

আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশ যে পৃথিবীর অন্য দশটা দেশ থেকে ভিন্ন তার একটা বড় কারণ, মুক্তিযুদ্ধের পর এই দেশে অনেক মা ঘর থেকে বের হয়ে সংগ্রাম শুরু করেছেন। বেঁচে থাকার জন্যে সেই সংগ্রামের কথা কতোজন জানে ? মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে যে যুদ্ধ করেছে মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের দেশের সেই মায়েদের যুদ্ধ তাঁদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। আমরা কী সেটা মনে রাখি ?

একদিন যখন বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াবে তখন আমরা কী বাংলাদেশের সেই অসংখ্য মায়েদের কথা স্মরণ রাখব ? যে সাদাসিধে মায়েরা সন্তানদের রক্ষা করার জন্যে সিংহীর সাহস নিয়ে কঠিন পৃথিবীর মুখোমুখি হয়েছিলেন ? বুক আগলে তাদের রক্ষা করেছিলেন ?

আমি আজকে আমার নিজের মায়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের এরকম অসংখ্য মা'দের কাছে একটুখানি ভালোবাসা পৌঁছে দিতে চাই। একটুখানি শ্রদ্ধা পৌঁছে দিতে চাই।

শব্দ-কল্প-দ্রুম

১.

ঠিক কীভাবে এটা শুরু হয়েছে তার খুঁটিনাটি মনে নেই। সারা পৃথিবীতেই বানানের একটা প্রতিযোগিতা হয় - আমাদের দেশেও হয়েছে তবে সেটা বাংলার জন্যে নয় - ইংরেজির জন্যে! খুব চমৎকার আয়োজন - কম বয়সী ছেলেমেয়েদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে মনটা ভরে যায়। তখনি সম্ভবত মনে হয়েছিল বাংলার জন্যে এরকম একটা আয়োজন কি আরও বেশী প্রয়োজন নয়? ইংরেজী বানানের মাঝে একটা শৃংখলা আছে, বাংলা বানান নিয়ে আমি নিজে হাবুডুবু খেয়ে যাই, ছেলেবেলায় একরকম বানান লিখেছি এখন অন্যভাবে লেখা হয়। চেনা শব্দগুলোও কেমন জানি অচেনা মনে হয়। আমি সেটা নিয়ে মোটেও অভিযোগ করছি না, ভাষা থেকে জীবন্ত আর কিছু পৃথিবীতে নেই। যেই ভাষা যত বেশী জীবন্ত সেই ভাষায় তত বেশী পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনে ভাষা তত বেশী সমৃদ্ধ হয়। কাজেই পরিবর্তন নিয়ে বুড়ো মানুষের মত অভিযোগ করা যাবে না।

কাজেই দেশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাংলা বানানের প্রতিযোগিতা একটা সুন্দর বিষয় হতে পারে কিন্তু সমস্যা হলো সেটা আয়োজন করবে কে? আমাদের দেশের সংবাদপত্র এরকম অনেক কিছু আয়োজন করে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন একটি সংবাদপত্র এরকম কিছু আয়োজন করার সাহায্য করে তখন অন্য সব পত্রিকা সেটাকে রীতিমত বয়কট করে! রীতিমত ছেলেমানুষী ব্যাপার, চমৎকার আয়োজনগুলো পর্যন্ত কেমন জানি একঘরে হয়ে যায়। তবে আমাদের বাংলা বানান প্রতিযোগিতার বেলায় সমস্যাটার সমাধান খুব সহজে হয়ে গেল, বাংলাদেশের বাংলা সার্চ ইঞ্জিন পিপীলিকা এই উদ্যোগটি নিতে রাজী হল। পিপীলিকা আমাদের জন্যে নূতন কিছু নয় - আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকরাই এটা তৈরি করেছে - এক অর্থে এটি আমাদেরই প্রতিষ্ঠান। সাথে আছে এক সময়কার জিপিআইটি সেটি বর্তমানে Accenture! আমার জানা মতে পিপীলিকা এক অর্থে এই দেশে একটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটা ইন্ডাস্ট্রির প্রথম যৌথ উদ্যোগ।

কোন একটা কিছু শুরু করতে হলে তার একটা নাম দিতে হয় তাই বাংলা বানান প্রতিযোগিতাটিরও একটা নাম দরকার। যারা এটা আয়োজন করেছে তারা চিন্তা ভাবনা করে এর নাম দিয়েছে "শব্দকল্পদ্রুম" - এর থেকে যথাযথ নাম হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় না! আমাদের প্রজন্মের সবাই শব্দকল্পদ্রুম শব্দটির সাথে পরিচিত সুকুমার রায়ের এই নামে একটি কবিতার কারণে। (কবিতার প্রথম দুটি লাইন এরকমঃ ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা- / ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পটকা!)

তবে শব্দকল্পদ্রুমের আরো একটি পরিচয় আছে, দ্রুম মানে বৃক্ষ বা গাছ। কল্পদ্রুম বা কল্প তরু মানে এমন একটি গাছ যার কাছে যাই চাওয়া যায় সেটাই পাওয়া যায়। তাই শব্দকল্পদ্রুম মানে শব্দের একটি কল্পতরু - অর্থাত তার কাছে যে কোনো শব্দ চাইলেই সেই শব্দটি পাওয়া যাবে! সোজা কথায় সেটি হচ্ছে অভিধান বা ডিকশনারী। সত্যি কথা বলতে কী রাধাকান্ত দেব নামে একজন খুব জ্ঞানী মানুষ চল্লিশ বছর খাটাখাটনী করে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে শব্দকল্পদ্রুম নামে একটা বাংলা অভিধান তৈরী করেছিলেন। আমাদের বাংলা বানান প্রতিযোগীতার নামকরণ করার পর আমরা আবিষ্কার করলাম ঠিক এই নামে হায়াৎ মাহমুদ একটা অসাধারণ বই লিখেছেন। শুদ্ধ ভাবে বাংলা লেখা শেখার জন্যে এই দেশের কিশোর কিশোরীদের এর থেকে চমৎকার কোনো বই আমার চোখে পড়েনি!

তথ্য প্রযুক্তির কারণে সারা পৃথিবীতেই বানানের একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে! একটা সময় ছিল যখন কিছু একটা করতে চাইলে বানানটি শুদ্ধভাবে লিখতে হতো- আজকাল তার আর দরকার হয় না। ভুল-ভাল একটা বানান লিখলেও সার্চ ইঞ্জিন গুলো ঠিক-ঠাক উত্তর দিয়ে দেয়। অন্যদের কথা জানি না- আমি নিজেও "গুগল" ব্যবহার করতে হলে শুদ্ধ বানান লেখার জন্যে এতো ব্যস্ত হই না আলসেমী করে কাছাকাছি একটা লিখে বসে থাকি! বাংলার জন্যেও আজকাল সেটা ঘটতে যাচ্ছে - তাই আমরা ঠিক করেছি আমাদের পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিনে কেউ ভুল বানান লিখলে তাকে অন্তত পক্ষে শুদ্ধ বানানটি জানিয়ে দেয়া যবে! এক অর্থে পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিনকে ইচ্ছে করলে বাংলা অভিধান কিংবা "শব্দকল্পদ্রুম" হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। (কাজটি অনেক সহজ হতো যদি বাংলা একাডেমি তাদের অভিধানের শব্দগুলো আমাদের ব্যবহার করতে দিতো। এখন আমাদের প্রায় বিশ হাজার শব্দ নূতন করে টাইপ করতে হচ্ছে!)

এটি সত্যি এক সময় ভাষার জন্যে সকল কাজকর্ম গবেষণা করতেন ভাষাবিদেরা, আজকাল তার পরিবর্তন হয়েছে - এখন তথ্যপ্রযুক্তিবিদেরাও ভাষার জন্যে কাজ করে। আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই যখন দেখি বাংলাকে কম্পিউটারে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষার বিচিত্র বিচিত্র দিকে রীতিমত বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে! যে সমস্ত বিষয়গুলো শুধুমাত্র ভাষাবিদেরা জানতেন, যেগুলো নিয়ে কথা বলতেন আজকাল আমার ছাত্রছাত্রী কিংবা তরুণ শিক্ষকেরা সেগুলো নিয়ে কথা বলে। দেখে খুব ভালো লাগে - তবে সত্যি সত্যি যদি বাংলা বানান প্রতিযোগিতার যদি সত্যিকারের একটা উদ্যোগ নিতে হয় তাহলে সেখানে আমাদের দেশের বড় বড় ভাষাবিদ লেখক সাহিত্যিকদের একটু সাহায্য নেয়া দরকার। দেশের বড় বড় মানুষেরা বড় বড় কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই ধরেই নিয়েছিলাম তাদের সমর্থন পাব কিন্তু তারা হয়তো সত্যিকার অর্থে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন না। কিন্তু আমি খুব বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করলাম এই দেশের বড় বড় ভাষাবিদ কবি সাহিত্যিক লেখকেরা আমাদের অনেক সময় দিলেন। তাঁদের সাথে কথা বলে "শব্দকল্পদ্রুম" কে শুধু বানানের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলা ভাষার জন্যে ভালোবাসার একটা উদ্যোগ হিসেবে দাঁড়া করানোর পরিকল্পনা করা হলো।

শুধুমাত্র ঢাকা শহরে না করে সারা দেশে করার ইচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা কেমন হবে তার কোনো ধারণা নেই, তার পরিকল্পনা করা হলো প্রথমে চট্টগ্রামে একটা পরীক্ষামূলক পর্ব করে দেখা হবে - সেই অভিজ্ঞতা যদি ভালো হয় তখন সারা দেশে তার আয়োজন করা যেতে পারে।

গত শুক্রবার ১৭ অক্টোবর এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শনিবার সারাদিনব্যাপী চট্টগ্রাম শহরের সেন্ট প্লাসিড স্কুলে শব্দকল্পদ্রুমের আয়োজন করা হলো। অন্যদের কথা জানি না এই দুটি দিন অসংখ্য শিশু কিশোরের সাথে থেকে আমিই অপূর্ব কিছু সময় কাটিয়েছি!

আব্দুল্লাহ্ আবু সায়ীদ স্যার এই দেশের শিশু কিশোরদের কাছে খুব প্রিয় একটি নাম, তাকে কোনো ভাবে একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত করাতে পারলেই সেই অনুষ্ঠান সফল হয়ে যায়। শব্দকল্পদ্রুমে শুধু আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার নন, শিশু কিশোরদের প্রিয় লেখক আলী ইমাম এবং ভাষাবিদ হায়াৎ মাহমুদ ও ঢাকা থেকে চলে গিয়েছিলেন! অনুষ্ঠানের শুরুতে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার উপস্থিত প্রায় বারোশত শিশু কিশোরদের সাথে গল্প করে আমাদের মাতৃভাষার কথা বললেন। সাধারণত তাঁর বক্তব্যের পর অন্য কেউ কথা বলতে সাহস পায় না - কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানে একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেল। তার বক্তব্যের পর হুইল চেয়ারা বসে বসে সাবরিনা সুলতানা শিশু কিশোরদের বোঝালো কেন আমাদের দেশে হুইল চেয়ারে বসে থাকা শিশুই হোক, কিংবা বাক বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুই হোক সবারই স্কুলে যাবার অধিকার আছে - সাবরিনা সুলতানা এতো সুন্দর করে কথা বলেছে যে সব শিশুরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথা শুনেছে! আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই শিশুগুলো যখন বড় হবে, বড় বড় দায়িত্ব নেবে তখন অন্তত তারা এই দেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে!

শব্দকল্পদ্রুমে বানান এবং ভাষার মজার মজার অনেক কিছু নিয়ে ঘন্টা খানেকের একটা লিখিত পরীক্ষার মত হয়েছিল। বাংলাদেশের শিশুদের জন্যে এই ধরণের অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, নানা ধরণের অলিম্পিয়াড হয়। তবে আমার ধারণা এই প্রথম একটি প্রতিযোগীতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এবং ব্রেইলে উত্তর লিখে দিয়েছে! আমার খুব আনন্দ হয়েছে যখন দেখেছি তাদের বাংলা বানানের জ্ঞান অন্যান্য ছেলেময়েদের তুলনায় যথেষ্ট ভালো!

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অনুষ্ঠানে আমরা সবসময়েই তাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ করে দিই - যারা এ ধরণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছে তারা জানে কতো বিচিত্র ধরণের প্রশ্ন দিয়ে তারা বড় বড় মানুষদের নাস্তানুবাদ করে দেয়! ভাগ্যিস সেখানে আব্দুল্লাহ্ আবু সায়ীদ, আলী ইমাম এবং হায়াৎ মাহমুদের মতো মানুষেরা ছিলেন তাই তাদের বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দেয়া গেছে! কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি - মানুষ মারা গেলে কেন সেটাকে "পটল তোলা" বলা হয় সেরকম একটা প্রশ্ন! দোয়েল পাখী থেকে কাক অনেক বেশী, তাহলে জাতীয় পাখী কাক কেন হলো না সেরকম আরেকটি প্রশ্ন !

সব প্রশ্নই যে মজার প্রশ্ন ছিল তা নয় কিছু কিছু প্রশ্ন আমাদের লজ্জিত করেছে, ব্যথিত করেছে। একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে আমাদের জিজ্ঞেস করল ভাষা মতিনের মতো একজন মানুষ যিনি মৃত্যুর পর নিজের চোখ পর্যন্ত দান করে গেছেন তাকে কেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হল না ? আমাদের কাছে মাথা নিচু করে থাকা ছাড়া এই প্রশ্নের আর কোনো উত্তর ছিল না !

প্রতিযোগিতার শেষে পুরষ্কার দেয়া হয় - দেখে মনে হতে পারে এটি বুঝি খুব আনন্দের একটা অংশ, আসলে এই অংশটি আমার কাছে দুঃখের। যারা পুরষ্কার পায় তাদের আনন্দ থেকে আমাকে বেশী দুঃখ দেয় যারা পুরষ্কার পায়নি বলে মন খারাপ করে। সে জন্যে এ ধরণের অনুষ্ঠানে আমি সব সময়েই বাচ্চাদের বোঝানোর চেষ্টা করি প্রতিযোগিতা বিষয়টা আসলে খুব ভালো কিছু নয়! পৃথিবীর কোনো বড় কাজ প্রতিযোগিতা দিয়ে হয় না - সব বড় কাজ হয় সহযোগিতা দিয়ে। এই যে বাংলা ভাষার জন্যে ভালোবাসার অনুষ্ঠান শব্দকল্পদ্রুম - এর আয়োজন করার জন্যেও অনেক ভলান্টিয়ার দিন রাত কাজ করেছে। ভলান্টিয়ারদের খুঁজে বের করা হয়েছে ইন্টারনেটে ঘোষনা দিয়ে! আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনোই বিশ্বাস করতাম না যে শুধু মাত্র ইন্টারনেটের ঘোষণা দেখে এতোগুলো ছেলে মেয়ে কাজ করার জন্যে চলে এসেছে। (ফিরে আসার বাসের সময়টা হঠাৎ করে এগিয়ে নিয়ে আসায় আমার হঠাৎ করে চলে আসতে হয়েছে বলে এই ভলান্টিয়ারদের ঠিক করে ধন্যবাদ পর্যন্ত দিয়ে আসতে পারিনি!)

কোনো অনুষ্ঠানে গেলে আমাকে বাচ্চাদের অনেক অটোগ্রাফ দিতে হয়। আজকাল শুধু অটোগ্রাফে শেষ হয় না তার সাথে সাথে "ফটোগ্রাফ" ও তোলা হয়। শুধু ফটোগ্রাফে শেষ হয়ে যায় না - সেলফি তুলতে হয়। যারা এখনো শব্দটার সাথে পরিচিত হয় নি তাদের বলে দিই, নিজের ছবি নিজে তোলার নাম সেলফি, আগে ডিকশনারীতে এই শব্দটি ছিল না এখন যোগ করা হয়েছে।

ডিকশনারীতে নূতন শব্দ যোগ করা যায় তার এরকম জলজ্যান্ত উদাহরণ আছে বলে শব্দকল্পদ্রুমে আমরা ছেলেমেয়েদের নূতন শব্দ তৈরী করারও একটা সুযোগ করে দিয়েছিলাম। প্রথমবার বলে আমরাই পাঁচ ধরণের মানুষের কথা বলেছি! প্রথমটি ছিল, যার সত্যিকারের বন্ধু নেই, সব ফেসবুকের বন্ধু! এই ধরণের মানুষের জন্য ছেলেমেয়েরা অনেক বিচিত্র নাম নিয়ে এসেছে, কয়েকটা এরকমঃ ফেসবুকানী, ফেস-পোকা কিংবা আলে-বান্দর! ঠিক এরকম, যে শিক্ষক ক্লাশে পড়ায় না কিন্তু কোচিংয়ে পড়ায় - তার নাম দিয়েছে ল্যাম্পো মাস্টার, কোচিক্ষক কিংবা লোভীক্ষক! যে দিন রাত কম্পিউটারে গেম খেলে, তাকে বলেছে গেম-খিলাড়ি কিংবা গেম বাবু! পাকিস্তান বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলায় যে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে তাদেরকে বেশীরভাগই রাজাকার ডেকেছে। এ ছাড়াও আছে পাকিংলাদেশী এবং বাংকিস্তানী! যে ভাত খেতে চায় না শুধু ফ্রাইড চিকেন খেতে চায় তাদেরকে নাম দিয়েছে হাভাতে-চিকেন কিংবা খুবই সংক্ষেপে চিকু! নিছক মজা করার জন্যেই এই নূতন শব্দের জন্ম, কিন্তু কে বলবে একদিন হয়তো এরকম একটা শব্দ ডিকশনারীতে স্থান পেয়ে যাবে।

২.

এতোক্ষণ যে কথাগুলো বলেছি সেটা হচ্ছে ভূমিকা, এবারে আসল বক্তব্যে আসি। আমরা দিন রাত বংলায় কথা বলি বলে এই ভাষাটি কী অসাধারণ সেটা সবসময় লক্ষ্য করি আন। কম্পিউটারে বাংলা ভাষার স্থান করে দিতে গিয়ে আমি নিজে অনেক কিছু প্রথমবারের মতো আবিষ্কার করেছি যেগুলো ভাষাবিদেরা বহুদিন থেকে জানেন! যারা একটু স্বচ্ছল তারা বাংলা থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ইংরেজীতে। অনেক পরিবারেই ছেলেমেয়েদের পাওয়া যাবে যারা বাংলা পড়তে পর্যন্ত চায় না। অনেকেই বাংলা পড়তে চাইলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প পড়তে চায় না। অনেক ছোট ছোট শিশু টেলিভিশনের সামনে বসে বসে বাংলা শেখার আগে হিন্দী শিখে বড় হচ্ছে। টেলিভিশনে এক ধরণের বিচিত্র বাংলা উচ্চারণ আছে - রেডিওতে সেটি আরো ভয়াবহ। আজকাল সবচেয়ে সস্তা মোবাইল টেলিফোনেও বাংলা লেখা যায় কিন্তু বেশীর ভাগ এস.এম.এস লেখা হয় ইংরেজী হরফে। ইচ্ছে করলে এই তালিকা আরো অনেক দীর্ঘ করা যায় - কিন্তু মন খারাপ করা কথা লিখতে ভালো লাগে না!

তাই আমার মনে হয় যারা বড় হয়ে গেছে তাদেরকে হয়তো বাংলা ভাষা নিয়ে আর উৎসাহিত করা যাবে না কিন্তু যারা ছোট তাদের ভেতরে নিশ্চয়ই নূতন করে একটা ভালো লাগার জন্ম দেয়া সম্ভব। সবাই মিলে সেই কাজটাই শুরু করে দিই না কেন ?

কিন্তু......

১.

যতই দিন যাচ্ছে আমি ততই "কিন্তু" শব্দটার উপর বিরক্ত হয়ে উঠছি। আমার মনে হয় আমাদের ভাষায় এই শব্দটা তৈরী হয়েছে প্রতারণা করার সুযোগ দেয়ার জন্য। সোজা ভাষায় বলা যায় দুই নম্বুরী কাজ করার জন্য। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার টেলিভিশন দেখার খুব একটা সুযোগ হয় না কিন্তু নভেম্বরের ৩ তারিখ রাত্রিবেলা আল জাজিরায় বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উপর একটা অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে অন্যান্যদের সাথে জামাতে ইসলামীর আইনজীবি টবি ক্যাডম্যান বক্তব্য রাখছিল। সে বলল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়েছিল এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল জামাতে ইসলামী স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এসবই ঠিক আছে। কিন্তু - টবি ক্যাডম্যান এই "কিন্তু" শব্দটা উচ্চারণ করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যে কী পরিমাণ নিম্নমানের এবং কী পরিমাণ অগ্রহণযোগ্য তার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে শুরু করল। আমাদের ভাষায় যদি "কিন্তু" শব্দটা না থাকতো তাহলে কী সে এই দুই নম্বুরী কাজটা করতে পারতো? ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তার পদলেহী জামাতে ইসলামীর রাজাকার আলবদর বাহিনী মিলে এই দেশে কী নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে সেই কথাটুকু বলে তার বক্তব্য শেষ করে ফেলতে হতো। তাকে বলতে হতো এই দেশকে কলংকমুক্ত করতে হলে তাদের বিচার করতেই হবে। চল্লিশ বছর পরে হলেও করতে হবে। শুধুমাত্র "কিন্তু" শব্দটার জন্য সারা পৃথিবীর যত প্রতারক এবং যত ভন্ড মানুষ আছে তারা প্রথমে ভালো ভালো কথা বলে শেষে দুই নম্বুরী কথা বলতে শুরু করে। তবে টবি ক্যাডম্যানের কথা আলাদা, তাকে জামাতে ইসলামী টাকা দিয়ে এইসব কথা বলার জন্যে ভাড়া করেছে, তাকে এই কথাগুলো বলতেই হবে। তার পরেও কথাগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল - একটু পরে পরে তার পানি (কিংবা অন্য কিছু) খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিতে হচ্ছিল!

শুধু জামাতের ভাড়া করা সাদা চামড়ার মানুষ নয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করার পর ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোকেও এই "কিন্তু" মার্কা কথা বলতে শুনেছি। তারা প্রথমে বলে, অবশ্যই এই নৃশংস গণ হত্যার বিচার করতে হবে, তারপর একটু দম নিয়ে বলে "কিন্তু", তারপর "গরুর রচনা" (অর্থাত আন্তর্জাতিক মানের বিচার হতে হবে) শুরু করে দেয়। আমাদের ষোল কোটি মানুষের দেশে কতো কিছুই তো আন্তর্জাতিক মানের নয় - লেখাপড়া আন্তর্জাতিক মানের নয় (প্রশ্ন ফাঁস হয়, দুই হাতে গোল্ডেন ফাইভ বিতরণ করা হয়), চিকিৎসা আন্তর্জাতিক মানের নয় (টাকা না দিলে চিকিৎসা শুরু হয় না, বিল শোধ না করলে মৃতদেহ আটকে রাখা হয়), ইলেকট্রিসিটি আন্তর্জাতিক মানের নয় (সারা দেশের গ্রীড ফেল করে দশ ঘন্টা পুরো দেশ অন্ধকার হয়ে থাকে), নিরাপত্তা বাহিনী আন্তর্জাতিক মানের নয় (র‍্যাব

টাকা খেয়ে সাতজনকে খুন করে ফেলে), এমন কী টয়লেট পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানের নয় (হাই কমোড নেই, ফ্লাশ নেই), কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার সেসব কিছু নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই, তাদের একমাত্র মাথা ব্যাথা একাত্তরের কিছু নৃশংস খুনীদের বিচারের বেলায়। এর আগেওতো এই দেশে কতো বিচার হয়েছে, চুরি ডাকাতী রাহাজানি থেকে শুরু করে খুন ধর্ষন কিছুই তো বাদ যায়নি। তখন তো কোন দেশকে বলতে শুনিনি এই দেশে অপরধীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক মানের বিচার হচ্ছে না।

আমাদের দেশের সেই একই বিচার ব্যাবস্থা যখন পুরোপুরি এই দেশের আইনে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছে তখন হঠাৎ করে তাদের মনে পড়ল যে বিচার আন্তর্জাতিক মানের হচ্ছে না। আমরা এখন সবাই জানি ব্যপারটা কেমন করে ঘটেছে। শুধুমাত্র আমেরিকাতে জামাতে ইসলামী ২৫ মিলিওন ডলার খরচ করেছে সেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে নিজের দিকে টেনে নেয়ার জন্যে। পত্রপত্রিকায় এর উপর বিশাল রিপোর্ট বের হয়েছে, পড়ে বমি করে দিতে ইচ্ছে করে। টাকা দিয়ে অনেক কিছু কেনা যায় (ডলার হলে আরেকটু ভালো হয়), কিন্তু একাত্তর নির্যাতিত মানুষের বুকের ক্ষোভকে পৃথিবীর কোনো অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। যতদিন এই দেশের মানুষ এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শেষ করে মাতৃভূমির কলংক মোচন করতে চাইবে ততদিন বাইরের কোন শক্তি আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে পারবে না। আমি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের কাছে কৃতজ্ঞ, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে কৃতজ্ঞ যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়টি তীব্রভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ এই সরকারের কাছে, যারা আমাদের কথা দিয়েছিল যে নির্বাচিত হলে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে এবং তারা তাদের কথা রেখেছে।

২.

সিলেটে কৃষিকাজে ব্যবহার করার জন্যে যন্ত্রপাতি তৈরি করার একটা ফ্যাক্টরি আছে, বেশ কয়েক বছর আগে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সেই ফ্যাক্টরি থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের ফ্যাক্টরিটা দেখার জন্যে। আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, আমাদের দেশের একেবারে নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতিগুলো দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। ফ্যাক্টরির মালিক কর্মকর্তারাও আমাকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। চলে আসার আগে তারা তাদের 'ভিজিটার্স বুক' বের করে নিয়ে আমাকে অনুরোধ করলেন তাদের উদ্দেশে কিছু একটা লিখে দিতে। আমি আমার কথাগুলো লিখে স্বাক্ষর করার আগে থমকে গেলাম, আমার ঠিক আগে বাংলাদেশের সেই সময়কার শিল্পমন্ত্রীর নিজের হাতের স্বাক্ষর, স্পষ্ট অক্ষরে তার নাম লেখা, মতিউর রহমান নিজামী।

আমি কলমটি কিছুক্ষণ ধরে রেখে আমার নিজের নামটি স্বাক্ষর করলাম। তীব্র এক ধরনের অপমান বোধ আমাকে গ্রাস করে রেখেছিল, যে মানুষটি বদরবাহিনীর প্রধান হয়ে এই দেশে পৃথিবীর ভয়াবহতম হত্যাযজ্ঞের সহযোগিতা করেছে তাকে এই দেশের মন্ত্রী করে তার গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ এই মানুষটি বাংলাদেশের জন্মলগ্নে গলা টিপে এই দেশটিকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এর চাইতে বড় দুঃখ, লজ্জা, গ্লানি, অপমান কী হতে পারে!

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হবার পর অনেকদিন পার হয়ে গেছে, সবাই যেরকম দ্রুত একটা বিচার দেখতে চাইছিল ঠিক সেভাবে বিচার হচ্ছিল না বলে অনেকের ভেতর এক ধরনের হতাশার জন্ম হচ্ছিল। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে অনেকের ধারণা আমি বুঝি অনেক ভেতরের খবর জানি, তাই আমার সাথে দেখা হলেই অনেকে জানতে চাইতো কী হচ্ছে? আসলেই কি যুদ্ধাপরাধীর বিচার শেষ হবে ?—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন তাদের পাল্টা প্রশ্ন করতাম, তাদের কি জামায়াত-বিএনপি আমলের সেই জোট সরকারের কথা মনে আছে যখন দুই দুইজন কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী সেই সরকারের মন্ত্রী ছিল? যারা তাদের গাড়িতে এই দেশের পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো ? যারা প্রশ্ন করেন তারা সবাই মাথা নেড়ে স্বীকার করেন যে, হ্যাঁ তাদের সবারই সেই অবিশ্বাস্য দিনগুলোর কথা মনে আছে। তখন আমি তাদের জিজ্ঞেস করি তারা কি তখন কল্পনা করেছিলেন যে একদিন সব যুদ্ধাপরাধী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে বসে থাকবে, একজন একজন করে তাদের বিচার করা হবে ? (মনে আছে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ঘোষণা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ করা হলেই সমগ্র চট্টগ্রামে আগুন লেগে যাবে। কোথায় সেই আগুন?) গোলাম আযমকে যখন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছিল তখন সবাই মন খারাপ করেছিল। এখন কি আমরা বলতে পারি না এই দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এদেশে থেকে যাওয়ার জন্যেই তাকে ধরে জেলখানায় রাখা সম্ভব হয়েছিল ? যুদ্ধাপরাধীর শাস্তি পেয়ে তাকে জেলখানায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই কলঙ্কমোচনের কাহিনী আজীবনের জন্যে লেখা হয়ে গেল!

যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে সরকারের সদিচ্ছার ওপর সন্দেহ প্রকাশ করেন তারা সবাই কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হন জামায়াত-বিএনপির জোট সরকারের আমলে তারা কেউ কল্পনা করেননি সত্যি সত্যি এই দেশের মাটিতে আমাদের জীবদ্দশায় তাদের বিচার শুরু হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে যাদের মনে হতাশা সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ছিল গত কয়েকদিনের বিচারের রায় দেখে তাদের সেই হতাশা, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস অনেকটুকুই কেটে গেছে। আমরা এখন নিশ্চিতভাবে জানি আর কখনোই আমাদের সেই অন্ধকার দিনগুলোতে ফিরে যেতে হবে না।

৩.

একটা সময় ছিল যখন দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীরা এই দেশে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতো। একজন আমাকে বলেছেন যে সেই সময়ে নাকি কিছু রাজাকার একাত্তরে তাদের বকেয়া বেতনের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হওয়ার পর খালেদা জিয়া বেশ অনেকবার সেটাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি চেয়েছেন।

ইদানীং সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। একজন যুদ্ধাপরাধীর রায় বের হবার পর বিএনপি আর তাদের মুক্তির কথা বলে না। দেশের অন্যসব মানুষের মতো গ্লানিমুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারে না, আবার সেটি নিয়ে তাদের আপত্তিটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। গোলাম আযমের জানাজায় বিএনপির কোনো নেতা হাজির থাকার সাহস করেনি; যিনি হাজির ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর হিসেবে তার উপস্থিতি নিশ্চয়ই একটা তামাশার মতো ছিল! গোলাম আযমের ছেলে বিষয়টি নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ, দেশের সেরা দেশোদ্রোহীর সন্তান হওয়ার চাপ নিশ্চয়ই খুব বেশি, সেই চাপেই সম্ভবত তিনি বিএনপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে জামাতের সাহায্য ছাড়া বিএনপি কখনো ক্ষমতায় যেতে পারবে না। তার এই চ্যালেঞ্জটি কী জামায়াতের শক্তির কথা বলেছে নাকি বিএনপি এর দুর্বলতার কথা বলেছে আমি বুঝতে পারিনি। রাজনীতির জটিল হিসাব আমি বুঝি না, কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের হিসাব আমি খুব ভালো করে বুঝি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে দেশটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন পাঠ্যবই, রেডিও টেলিভিশন বা মিডিয়াতে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হতো না, দেশদ্রোহী রাজাকারদের নৃশংসতার কথা বলা হতো না। সে সময় এই দেশে একটা বিভ্রান্ত প্রজন্মের জন্ম হয়েছিল, সে কারণেই জামায়াতকে সঙ্গী করে বিএনপি নির্বাচনে জিতে আসতে পেরেছিল। আমার হিসাবে জামায়াতকে নিয়ে জোট করাটি ছিল এই দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। আমি তখন নূতন দেশে ফিরে এসেছি, জামায়াতকে নিয়ে জোট করার পর তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের ছেলেদের হাহাকারের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, এই দেশে নূতন প্রজন্ম এসেছে, তারা মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনে বড় হয়েছে, নিজের দেশের জন্যে তাদের বুক ভরা ভালোবাসা, দেশ নিয়ে তাদের স্বপ্ন, তাদের অহংকার। এই নূতন প্রজন্মের দেশপ্রেমের ভেতর যুদ্ধাপরাধীদের কিংবা যুদ্ধাপরাধীর দল জামায়াতে ইসলামের কোনো জায়গা নেই। এক যুগ আগে নির্বাচনে যেটা সম্ভব হয়েছিল ভবিষ্যতে আর কখনো সেটা সম্ভব হবে না!
এই দেশের মানুষ হিসেবে আমরা খুব বেশি কিছু চাই না। আমরা চাই সরকারি এবং বিরোধী দল দুটিই হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল! একটা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্যে আমি একবার শেরপুরের সোহাগপুরে গিয়েছিলাম, আমি তখন বিধবাপল্লীর সেই বিধবাদের দেখেছিলাম। আমার মাও সেই দুঃখীনি বিধবাদের মতো একজন দুঃখীনি হিসেবে তাঁর জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

আমি তাদের বুকের ভেতরকার কষ্ট আর হাহাকারের কথা জানি, তাদের ক্ষোভটুকু অনুভব করতে পারি। যে দেশের বাতাস এরকম অসংখ্য মায়ের দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে আছে সেই দেশে একটি রাজনৈতিক দল হত্যাকারীদের নিয়ে রাজনীতি করবে সেটি হতে পারে না।

বিধবা পল্লীর বিধবাদের অভিশাপ থেকে চল্লিশ বছরেও যুদ্ধাপরাধী কামারুজ্জামান মুক্তি পায়নি- অন্যেরাও পাবে না।

শৈশবের আনন্দটুকু ফিরিয়ে দিন

১.

সারাদেশে জেএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষার্থী এই ছেলেমেয়েগুলোর জন্য আমার খুব মায়া হয় কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সারাদেশে সবারই ধারণা হয়েছে এই পরীক্ষাটি জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যে করে হোক গোল্ডেন ফাইভ পেতে হবে (গোল্ডেন ফাইভ কথাটি কে আবিষ্কার করে বাচ্চাদের এত বড় সর্বনাশ করেছে আমার খুব জানার ইচ্ছে করে)। ছেলেমেয়েগুলোর ওপর যে চাপ দেয়া হয় সেটা একটা বিভীষিকার মতো। লেখাপড়ার নামে তাদের ওপর যে রকম নির্যাতন আর অত্যাচার করা হয় সে রকমটি মনে হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এবারে যন্ত্রণাটি ষোলো কলায় পূর্ণ হয়েছে ঠিক যখন তাদের পরীক্ষা দেয়ার কথা, তখন হরতালের পর হরতাল। (রাজাকার-আলবদর হয়ে এই দেশের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে অংশ নেবে, সেই অপরাধে শাস্তি দেয়া হলে দেশে হরতাল ডেকে বসবে - জামায়াতে ইসলামীর এই কাজকর্মগুলো দেশের মানুষ কিভাবে নিয়েছে সেটি কি তাদের চোখে পড়েছে?)

জেএসসি পরীক্ষার আগে আগে এবং পরীক্ষা চলার সময় আমি হঠাৎ করে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন বিভিন্ন জায়গা থেকে একই তথ্য পেতে শুরু করেছি। বিষয়টি একটু বললে সবাই বুঝতে পারবে।
এই দেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্কুলের হেড মাস্টার আমাকে তার একটা ছাত্রীর গল্প বললেন। সেই ছাত্রীর প্রস্তুতি ভালো নেই বলে হেড মাস্টার তাকে এই বছর পরীক্ষা না দিতে উপদেশ দিলেন। ছাত্রীটি তাকে জানাল, লেখাপড়ায় প্রস্তুতি তার ভালো না হতে পারে, কিন্তু তার পরীক্ষা অবশ্যই ভালো হবে। হেড মাস্টার জানতে চাইলেন কীভাবে? মেয়েটি বলল পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে বহু নির্বাচনী (MCQ) নৈর্ব্যক্তিক ৪০ শতাংশ থাকে সে তার পুরোটা পেয়ে যাবে কাজেই পাস করা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই! হেড মাস্টার ভদ্রলোক খুবই দুঃখ নিয়ে আমাকে বললেন, মেয়েটি একটুও ভুল বলেনি। পরীক্ষার হলে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে সঠিক উত্তর বের করে নেয়া এখন আর অন্যায় হিসেবে ধরা হয় না। পরীক্ষার হলের পরীক্ষকরা দেখেও না দেখার ভান করেন কারণ তারা চান ছাত্ররা দেখাদেখি করে ভালো মার্কস পেয়ে যাক সেটা ছাত্রছাত্রীর জন্য ভালো, স্কুলের জন্য ভালো ও সরকারের জন্য ভালো। পরীক্ষার হলে যে কোনো ছাত্রছাত্রী এখন এদিক-সেদিক থেকে একটু সাহায্য নিয়ে পুরোটা লিখে ফেলতে পারে। হতাশ হেড মাস্টার আমাকে জানালেন অনেক বড় বড় স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এখন নিজের দায়িত্বেই তাদের ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর বলে দেন।

এর কিছুদিন পরেই একেবারে গ্রামের স্কুলের একজন হেড মাস্টার আমাকে জানালেন, তিনি তার স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় খুব কড়াকড়ি করেন, তাদেরকে কোনোভাবেই দেখাদেখি করতে দেন না যার জন্য তার স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল আশপাশের অন্যান্য স্কুল থেকে খারাপ। সে কারণে তার স্কুলের ছেলেমেয়েরা বৃত্তি খুবই কম পাচ্ছে, সেটা নিয়ে ভদ্রলোক খুবই চাপের মাঝে আছেন। আমি তাকে সেটা নিয়ে এতটুকু চিন্তা না করে ছেলেমেয়েদের সৎ থাকা শেখানোটাতেই বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছি। তিনি কতদিন আমার উপদেশ শুনে সৎ থাকতে পারবেন আমি জানি না।

তৃতীয় ঘটনাটা ঘটেছে আজকে (১৯ নভেম্বর)। জেএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে এ রকম একজনের বাবা আমাকে বললেন, সারাদেশে গোল্ডেন ফাইভের যে মহামারী শুরু হয়েছে আমি সেটার জন্য দায়ী করেছি পরীক্ষার খাতা ঢালাওভাবে বেশি বেশি মার্কস দেয়ায় অলিখিত নির্দেশকে। আসলে এর জন্য সমানভাবে দায়ী পরীক্ষার হলে ছাত্রছাত্রীদের দেখাদেখি করার সুযোগকে। তার মতে, আজকাল পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করা, কথা বলাবলি করাকে কোনো অন্যায় বা দোষ মনে করা হয় না।

এক সময় পরীক্ষায় নকল করাটাকে আমরা সমস্যা হিসেবে দেখতাম। ছোট ছোট কাগজে গুটি গুটি করে লিখে নিয়ে আসা হতো এবং খুবই সাবধানে সেটা পরীক্ষার খাতায় টুকে নেয়া হতো। এখন তার প্রয়োজন হয় না, প্রশ্ন ফাঁস হয় বলে ছেলেমেয়েরা বাসা থেকেই প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে আসতে পারে। জটিল সমস্যার সহজ সমাধান। পরীক্ষার ফলাফল ভালো করার জন্য এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, আমরা যে কোনো মূল্যে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল ভালো করাতে চাই। ছোট ছোট শিশুদের আমরা এখন অন্যায় করাতে শিখিয়ে দিচ্ছি। এর চাইতে বড় অপরাধ কি হতে পারে ?

আমি জানি আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢালাওভাবে এটা অস্বীকার করবে। (প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে যখন আমি চেঁচামেচি করেছিলাম, তখন সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার গুজব ছড়াবে, তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে!)

২.

ঠিক কি কারণ জানা নেই, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যখন কোনো ঝামেলা হয়, তখন লোকজন সরাসরি আমাকে দায়ী করে! শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বড় বড় কর্মকর্তা কিংবা শিক্ষামন্ত্রীকে কেউ পায় না, কিন্তু আমাকে পাওয়া খুবই সহজ। আমাকে প্রচুর গালমন্দ শুনতে হয়। সবচেয়ে বেশি গালমন্দ শুনি ছোট বাচ্চাদের কৈশোর পার হতে না হতেই পিএসসি/জেএসসি/এসএসসি এবং এইচএসসি এই চার চারটি ভয়াবহ পাবলিক পরীক্ষা দেয়ার নিয়ম করে দেয়ার জন্য। অন্যদের সঙ্গে আমিও যেহেতু শিক্ষানীতি কমিটির একজন সদস্য ছিলাম, তাই অনেকেই ধরে নেয় এই ব্যাপারটিতে আমারও একটি হাত আছে !

আমার মনে হয় এখানে আসল বিষয়টা সবার জানা দরকার। আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, সেই কমিটি মোটেও চার চারটি পাবলিক পরীক্ষার কথা বলেনি। মাত্র দুটি পাবলিক পরীক্ষার কথা বলেছিল। সেই খসড়া শিক্ষানীতিতে কি লেখা ছিল আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি:

২য় অধ্যায় ২৪ অনুচ্ছেদ: পঞ্চম শ্রেণী শেষে সকলের জন্য উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে স্থানীয় সমাজ-কমিটি ও স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে বিভাগভিত্তিক পাবলিক পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষাটি প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে পরিচিত হবে।...

আমি সবাইকে লক্ষ্য করতে বলছি, এখন পিএসসি নামে একেবারে অবুঝ শিশুদের যে পরীক্ষা নেয়া হয়, সেটি কিন্তু খসড়া শিক্ষানীতিতে নেই। প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হওয়ার কথা অষ্টম শ্রেণী শেষে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে তাদের শুধু একটা সমাপনী পরীক্ষা নেয়ার কথা।

এবারে দেখা যাক এসএসসি এবং এইচএসসি সম্পর্কে খসড়া শিক্ষানীতিতে কী লেখা আছে:

৪র্থ অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ: দশম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা আঞ্চলিক পর্যায়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে (বিস্তারিত অধ্যায় ২১)। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা।... অর্থাৎ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি কিন্তু মোটেও চার চারটি পাবলিক পরীক্ষার কথা বলেনি, তারা মাত্র দুটি পাবলিক পরীক্ষার কথা বলেছে, একটি অষ্টম শ্রেণীর শেষে ও একটি দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে।

তাহলে আমরা কেন চার চারটি পাবলিক পরীক্ষা নিচ্ছি? ব্যাপারটা বোঝার জন্য এবারে আসল শিক্ষানীতির দিকে তাকাতে হবে। দেশের শিক্ষাবিদরা যে শিক্ষানীতি জমা দিয়েছেন, তার ওপর ছুরি চালিয়েছেন আমাদের আমলারা। জাতীয় শিক্ষানীতিতে লেখা হয়েছে এভাবে:

২য় অধ্যায় ২৭ অনুচ্ছেদ: '...পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে আপাতত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।'

সবাইকে লক্ষ্য করতে বলি, অষ্টম শ্রেণী শেষে যে পাবলিক পরীক্ষা হওয়ার কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে তার নামটা পাল্টে দেয়া হয়েছে এছাড়া কোনো বড় পরিবর্তন নেই।

সবচেয়ে বড় কথা পঞ্চম শ্রেণীর শেষে এখন পিএসসি নাম দিয়ে একেবারে অবুঝ শিশুদের যে পাবলিক পরীক্ষা নেয়া হয় জাতীয় শিক্ষানীতিতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। শিক্ষানীতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের আমলারা। এবারে আমরা যাই এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার অংশটুকুতে। খসড়া শিক্ষানীতিতে শিক্ষাবিদরা দশম শ্রেণী শেষে কোনো পাবলিক পরীক্ষার সুপারিশ করেননি, কিন্তু পরিবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে লেখা হয়েছে এভাবে:

৪র্থ অধ্যায় ১৪ পরিচ্ছেদ: 'দশম শ্রেণী শেষে জাতীয়ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা।...'

অর্থাৎ শিক্ষাবিদদের দেয়া শিক্ষানীতিতে দশম শ্রেণী শেষে কোনো পাবলিক পরীক্ষার কথা বলা হয়নি, জাতীয় শিক্ষানীতিতে সেটি আবার ফিরে এসেছে। তারপরও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, জাতীয় শিক্ষানীতিতে উল্লেখ না থাকার পরও পঞ্চম শ্রেণী শেষে কিভাবে একটা পাবলিক পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে? এই সিদ্ধান্তগুলো কারা নেন? কীভাবে নেন? কেন নেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার জানা নেই।

৩.

যারা ভাবছেন শিক্ষানীতিতে নেই এই যুক্তি দেখিয়ে যদি আমাদের বাচ্চাদের অন্তত একটি পাবলিক পরীক্ষা থেকে রক্ষা করা যায়, সেটাই খারাপ কি? তাদের সেই আশাতেও গুড়ে বালি! আমার কাছে শিক্ষা আইন ২০১৪-এর একটি খসড়া এসেছে, সেখানে লেখা আছে এভাবে:

১২(২): 'পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর একাডেমিক বৎসর শেষে বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাক্রমে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট (PSC) পরীক্ষা/এবতেদায়ি মাদরাসা পরীক্ষা (UDC) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC)/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষা দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে।...'

অর্থাৎ শিক্ষানীতিতে শিশুদের উদ্ধার করার যে একটি ছোট সুযোগ ছিল শিক্ষা আইনে সেই সুযোগটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে!

৪.

যারা শিক্ষানীতি কিংবা শিক্ষা আইনের কটমটে ভাষায় একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন, তাদের সহজ ভাষায় বলে দেয়া যায় যে, মূল শিক্ষানীতিতে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই সময়টুকুতে মাত্র দুটি পাবলিক পরীক্ষার কথা বলা হয়েছিল। সেটি পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষানীতিতে তিনটি পাবলিক পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে (কীভাবে জানি না)। জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চারটি পাবলিক পরীক্ষা নেয়া হয়।

সব স্কুলেই পরীক্ষা নেয়া হয়, সেই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র যদি স্কুলের শিক্ষকের পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে আসে তাতে দোষের কিছু নেই। সারাদেশের সব শিশুকে যদি একই মানদণ্ডে বিচার করা যায়, তাতেও দোষের কিছু নেই; বরং পুরো দেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলের লেখাপড়ার মানের একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপারটা সেভাবে থাকেনি লেখাপড়ার আসল উদ্দেশ্য থেকে সবাই অনেক দূরে সরে গেছে এখন পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য আর এর পুরো চাপটুকু সহ্য করতে হচ্ছে ছোট শিশু-কিশোরদের। আগে ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে বাবা-মায়েরা তাদেরকে কোচিং সেন্টারে নিয়ে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার কায়দাকানুন শিখিয়ে দিতেন, এখন সেটা শুরু হয় সেই পঞ্চম শ্রেণী থেকে। মোটামুটি একটা ভয়াবহ অবস্থা।

আমার মনে হয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটার সব কিছু নতুন করে দেখার সময় হয়েছে। একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময় হচ্ছে শৈশব, আমরা বুঝে হোক না বুঝে হোক আমাদের শিশুদের শৈশব থেকে সব আনন্দ কেড়ে নিয়েছি। তার বিনিময়ে যেটুকু পাওয়ার কথা, সেটুকু পাইনি; তাহলে শুধু শুধু কেন তাদেরকে এভাবে পীড়ন করছি? পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর আমি চিৎকার-চেঁচামেচি করে আবিষ্কার করেছি সরকার কোনো সমালোচনা শুনতে রাজি নয়, তারা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিতে থাকবে। এই দেশের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ যারা দেশের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেবেন, তারা কি ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের অবস্থাটা জানেন ? দোহাই আপনাদের কাছে, এই দেশের ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকে আনন্দটুকু কেড়ে নেবেন না।

দোহাই, আমাদের শিশুদের ক্রিমিনাল বানাবেন না

এতো দুঃখ নিয়ে আমি এর আগে কখনো কাগজ কলম নিয়ে বসিনি। গত বছর যখন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সবাই মিলে চিৎকার চেচামেচি করছিলাম, তখন একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলে গেছে আসলে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি, কিছু কিছু "সাজেশন" প্রশ্নপত্রের সাথে ঘটনাক্রমে মিলে গেছে মাত্র। যারা এটা বলেছেন তারা নিজেরাও জানেন, দেশের মানুষ এতো বড় নির্বোধ নয় যে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই কথাগুলো বিশ্বাস করবে। আমরা ভেবেছিলাম যথেষ্ট চেচামেচি করার কারণে এবারে হয়তো সবাই একটু বাড়তি সতর্ক থাকবে, প্রশ্নপত্র হয়তো এবারে ফাঁস হবে না।

আবারো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। আমার কাছে আগের রাতে পাঠানো হয়েছে। পরের দিন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখেছি। কেউ যদি বিশ্বাস না করেন, নিজের চোখে দেখতে পারেন (ছবি)। আমি যখন এই লেখাটি লিখছি, তখন আবার আমার কাছে প্রশ্নপত্রসহ ই-মেইল এসেছে। ইচ্ছে করলে কালকে মিলিয়ে দেখতে পারব, কিন্তু আর রুচি হচ্ছে না।

যারা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চালান, আমি অনুমান করতে পারি এই দেশের লেখাপড়া নিয়ে তাদের নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই, যদি থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই এরকম একটা কিছু ঘটতে দিতেন না। আমাদের শিক্ষানীতিতে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের জন্যে কোনো পাবলিক পরীক্ষার কথা বলা নেই। আমলারা নিজেদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এটি বের করে জোর করে এটা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাবা-মায়েরা আগে আরও বড় হওয়ার পর ছেলেমেয়েদের কোচিং করতে পাঠাতেন, এখন এই শিশুদেরকেই গোল্ডেন ফাইভ পাওয়ার জন্যে কোচিং করতে পাঠাচ্ছেন। তাতেই শেষ হয়ে যায়নি, এখন তাদের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করা হচ্ছে, ছোট ছোট শিশুদের হাতে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন ধরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা দিতে পাঠানো হচ্ছে, সেই ছোট ছোট শিশুদের অন্যায় করতে শেখানো হচ্ছে। সারা পৃথিবীর কোথাও এই নজির নেই, যেখানে একটি রাষ্ট্র তার দেশের শিশুদের অন্যায় করতে শেখায়। একটা দেশের মেরুদণ্ড পুরোপুরি ভেঙ্গে দেওয়ার কী এর চাইতে পরিপূর্ণ কোনো পদ্ধতি আছে? নাই। সারা পৃথিবীতে কখনও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। শুধু আমাদের দেশেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা একটা শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করার একটা প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। যে জাতি শৈশবে অন্যায় করতে শিখে বড় হয়, সেই জাতি দিয়ে আমরা কী করব ?

এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার হর্তাকর্তা বিধাতারা, আপনাদের কাছে করজোরে প্রার্থনা করি- আমাদের দেশের শিশুদের আপনারা মুক্তি দিন।

এই শিশুগুলো যদি কোনো পরীক্ষা না দিয়ে শুধুমাত্র বইগুলো নাড়াচাড়া করে সময় কাটিয়ে দিতো, তাহলে অন্তত তাদের একটা সুন্দর শৈশব থাকতো, তারা অন্তত অন্যায় করা শিখতো না।

আমাদের শিশুদের লেখাপড়ার দরকার নেই, দোহাই আপনাদের, তাদের ক্রিমিনাল করে বড় করবেন না!

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, ২০১৪
৩১০৪৪
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
পূর্ণমান—১০০

Date: Mon, 24 Nov 2014 22:36:47 +0600
From: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
To: mzi@sust.edu
Subject: Re: PSC Bangladesh & ....

শূন্যস্থান পুরন :
পৃঃ ১২ - খ
পৃঃ ২১ - ২ এর ক
পৃঃ ৪৬ - ২ এর খ
পৃঃ ৫৪ - ২ এর খ
পৃঃ ৭৭ - ২ এর চ
পৃঃ ৮২ - ২ এর গ
পৃঃ ৯৪ - ২ এর খ, ঘ
পৃঃ ১০৩ - ২ এর খ , ঘ
সঠিক উত্তর.
পৃঃ ২১ - ১.১
পৃঃ ৩২ - ১.৪
পৃঃ ৬৩ - ১.৪
পৃঃ ৭৭ - ১.১ , ১.৫
পৃঃ ৮১ - ১.১
পৃঃ ৮৬ - ১.২ , ১.৪
পৃঃ ১০২ - ১.১
পৃঃ ১০৩ - ১.২
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন.
পৃঃ ১৩ - ক , খ
পৃঃ ২২ - ক ,গ
পৃঃ ৪৭ - ক
পৃঃ ৫৫ - ঘ
পৃঃ ৬৪ - ক
পৃঃ ৭০ - ক , খ
পৃঃ ৭৮ - খ
পৃঃ ৯৪ – গ
পৃঃ ১৩- ৪ এর ঙ
পৃঃ ৩৩- ৫ এর গ
পৃঃ ৪৭- ৪ এর ক *কুটির শিল্প কি?
পৃঃ ৫৫-৪ এর ক, খ,ঙ
পৃঃ ৬৪- ৪ এর ঙ
পৃঃ ৭০- ৪ এর ক, ঙ
পৃঃ ৭৮- ৪ এর খ
পৃঃ ৮৭- ৪ এর ক
পৃঃ ৯৪- ৪ এর ঙ
পৃঃ ১১১-* সার্ক কি?
পৃঃ ১১৪- ৪ এর খ
রচনামূলক প্রশ্ন :
ক . মনে করো গত
সপ্তাহে তুমি বাংলাদেশের
১টি ঐতিহাসিক স্থানে পরিদর্শন
করেছো – এ সম্পর্কে ৫টি বাক্যলিখ।
খ . বুদ্ধিজীবি কারা ?
বুদ্ধিজিবি হত্যার ২টি কারন লিখ ।
তাদের হত্যার ২টি ফলাফল লিখ ।
গ . নিরাপদ পানি কাকে বলে ? নিরাপদ
পানি পান করা প্রয়োজন কেন ? নিরাপদ
পানি পান করার ৩টি উপায় লিখ ।
[] টিকা . মুজিব নগর সরকার সপথ
নিয়েছিল কবে ? মুজিব নগর সরকারের
রাষ্টপতি কে ?..
প্রশ্নঃ (এগুলো দেখে নাও)
১. মুজিবনগর সরকার কখন ও কথায় গঠিত
হয়েছিল? এ সরকার এ কারা ছিলেন?**
২. কাদের নিয়ে মুক্তি বাহিনীই গঠিত
হয়েছিল? ***
৩. পলাশি যুদ্ধ কেন হয়েছিল? এই যুদ্ধের
ফলাফল কি?***
৪. সার্ক ও জাতিসংঘের উদ্দেশ এর
পার্থক্য লিখ।***
৫.ত্রিপুরাদের উৎসবের বর্ণনা দাও।
৬. গনতান্ত্রিক মনোভাব কাকে বলে?
34 minutes ago · Sent from Mobile
[redacted]
বাংলাদেশ ও বিশ্ব
পরিচিতি
পৃষ্ঠাঃ১৩- ৪ এর ঙ পৃষ্ঠাঃ৩৩- ৫ এর গ
পৃষ্ঠাঃ৪৭- ৪ এর ক *
কুটির শিল্প কি? পৃষ্ঠাঃ৫৫-৪ এর ক, খ,
ঙ
পৃষ্ঠাঃ৬৪- ৪ এর ঙ পৃষ্ঠাঃ৭০- ৪ এর ক, ঙ
পৃষ্ঠাঃ৭৮- ৪ এর খ পৃষ্ঠাঃ৮৭- ৪ এর ক
পৃষ্ঠাঃ৯৪- ৪ এর ঙ পৃষ্ঠাঃ১১১-* সার্ক
কি?
পৃষ্ঠাঃ১১৪- ৪ এর খ
১. মুজিবনগর সরকার
কখন ও কথায় গঠিত
হয়েছিল? এ সরকার
এ কারা ছিলেন?**
২. কাদের
নিয়ে মুক্তি বাহিনীই
গঠিত হয়েছিল? ***
৩. পলাশি যুদ্ধ কেন
হয়েছিল? এই যুদ্ধের
ফলাফল কি?***
৪. সার্ক ও
জাতিসংঘের উদ্দেশ
এর পার্থক্য লিখ।
***
৫.ত্রিপুরাদের
উৎসবের বর্ণনা দাও।
৬. গনতান্ত্রিক
মনোভাব কাকে বলে

sir ata psc er bangladesh & bissso poriciti er question er ager question tou fhas hoicilo

মৃত ঘোড়া সমাচার

১.

আমি যখন খুব ছোট, তখন একদিন আমার বাবা আমার হাত দেখে বললেন, "তুই আশি বছর বাঁচবি।" শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, কী সর্বনাশ! মাত্র আশি বছর? মনে আছে মনের দুঃখে সারা রাত আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলাম এবং নানাভাবে আমাকে সান্তনা দিয়ে শান্ত করতে হয়েছিল। যাই হোক, এখন আমার বয়স বাষট্টি এবং আমি জানি বেঁচে থাকার জন্যে আশি বছর অনেক, আমার কপালে সেটা জুটবে কী না জানি না (যখনই কোনো জঙ্গী বাহিনীর খুন করার তালিকা উদ্ধার করা হয়, সেখানে আমার নামটি থাকে!)। যদি সত্যি সত্যি আশি বছর বেঁচে থাকতে পারি তাহলে একটা নূতন বাংলাদেশ দেখে যেতে পারব সেটা চিন্তা করে আজকাল আমি এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করি।

সেই শৈশব থেকে আমাদের দেশটি কতো বড় হতভাগা দেশ শুধু সেই কথাটিই শুনে এসেছি। যে দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে ছিলাম, তখন একটি বারও দেশ সম্পর্কে ভালো কিছু শুনিনি - সে দেশের যে কোনো সংবাদ মাধ্যমে 'বাংলাদেশ' শব্দটি লেখা হলে সাথে সাথে সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া হতো এটি বন্যা ঘূর্ণিঝড় দুর্ভিক্ষ দারিদ্রতার দেশ। আমি যখন দেশে ফিরে এসেছি, আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল এখন কেউ আর আমার দেশের নামটি শুনে আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে না। আমার চোখের সামনে খুব ধীরে ধীরে আমাদের দুঃখী দেশটি একটি হাসিখুশী দেশে পাল্টে যাচ্ছে (যারা সেটি দেখতে পায় না এখন আমি তাদের জন্যে করুণা অনুভব করি)। এক সপ্তাহ আগে একজন আন্তর্জাতিক গবেষকের একটা লেখা পড়ছিলাম যে, বাংলাদেশের সমুদ্রের নিচে সম্ভবত ২০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস রয়েছে; যদি সেটি ঠিক করে তোলা যায় তাহলে এই দেশটি পৃথিবীর গ্যাস সরবরাহকারী সবচেয়ে বড় একটি দেশ হয়ে যাবে।

আমি যখন এই লেখাটি পড়ছিলাম তখন আমার মনে হয়েছে সত্যি সত্যি এই গ্যাস আছে কী না কেউ এখনো নিশ্চিত নয়, এই গ্যাসটি তোলা যাবে কী না সেটাও কেউ ভালো করে জানে না। কিন্তু বাংলাদেশের অন্য বিশাল একটি সম্পদ যে রয়েছে এবং সেই সম্পদ নিয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটি যে আমাদের গ্যাস সম্পদ থেকে অনেক বেশী মূল্যবান, সেটি কেমন করে ভুলে যাচ্ছি? সেই সম্পদটি হচ্ছে আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা। এই দেশে তিন কোটি শিশু কিশোর স্কুলের ছাত্রছাত্রী, পৃথিবীর শতকরা আশি ভাগ দেশে তিন কোটি মানুষই নেই! এই বিশাল সংখ্যার স্কুলের ছেলেমেয়েদের যদি আমরা লেখাপড়া শিখাতে পারি তাহলে এই দেশে যে কী অসাধারণ একটা ম্যাজিক ঘটে যাবে সেটা কি কেউ কল্পনা করতে পারবে ?

নতুন সহস্রাব্দে তেল, গ্যাস, কল-কারখানা কিন্তু সম্পদ নয়, নতুন সহস্রাব্দে সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। আর সেই জ্ঞানটা তৈরি করতে, জমা করতে, বাড়িয়ে তুলতে দরকার মানুষ - আরও ঠিক করে বললে বলতে হয় ছাত্রছাত্রী। কাজেই আমাদের যে কী বিশাল একটা সম্ভাবনা একবারে দরজায় কড়া নাড়ছে সেটি কী সবাই জানে ?

শুধু কি তাই? আমাদের এই ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ছেলে আর মেয়ের সংখ্যা সমান সমান। লেখাপড়া জানা এই মেয়েরা যখন ছেলেদের পাশাপাশি সব জায়গায় কাজ করবে, সিদ্ধান্ত নেবে, নেতৃত্ব দেবে তখন যে বিপ্লবটুকু ঘটবে সেটা কী কেউ অনুভব করতে পারছে? আমরা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করি, জঙ্গী বাহিনী নিয়ে দুর্ভাবনা করি, একটা শিক্ষিত মা কী কখনও তার সন্তানকে নারী বিদ্বেষী, ধর্মান্ধ জঙ্গী দেশদ্রোহী হতে দেবে ? দেবে না।

কাজেই দেশের অনেক মানুষ যখন নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় হতাশাগ্রস্ত হয়, আমি তখন ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়াই। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কোনো দুর্ভাবনা নেই।

২.

লেখাপড়া নিয়ে আমার এক ধরনের আগ্রহ আছে, কৌতূহল আছে। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের ঠিক করে লেখাপড়া শেখানো চারটি খানি কথা নয় (সব স্কুলে একটা করে চক দিতে হলেই আশি হাজার চক কিনতে হবে!)। সরকার এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে এত কম টাকা দেয় যে সবকিছু গুছিয়ে করা সম্ভব না। তারপরও কাজটা খুব কঠিন তা আমার একবারও মনে হয় না। একটা উদাহরণ দিই: আমাদের দেশে লেখাপড়ার মাঝে পরীক্ষার গুরুত্ব খুব বেশি, এই দেশের ছেলেমেয়েরা যেটুকু তার চাইতে তাদের বাবা মায়েরা জিপিএ ফাইভের জন্যে অনেক বেশি পাগল! পৃথিবীতে যতদিন পরীক্ষা থাকবে ছাত্রছাত্রীরা ততদিন পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে চাইবে। শুধু এই ব্যাপারটা মনে রাখলেই লেখাপড়ার অনেকটুকু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যেহেতু সবাই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে চায় তাই পরীক্ষাটা হতে হবে অসম্ভব কৌশলী একটা পরীক্ষা। যেন পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের চেষ্টাতেই ঠিক ঠিক লেখাপড়া করতে পারে।

এখানে এই মুহূর্তে আমরা মার খেয়ে যাচ্ছি। সৃজনশীল পরীক্ষা ছিল তার প্রথম ধাপ, কিন্তু আমি আবিস্কার করেছি আমাদের শিক্ষকেরা এখনো ভালো সৃজনশীল প্রশ্ন করতে পারেন না। সেই সুযোগে সৃজনশীল গাইড বই বেরিয়ে গেছে, অনেক শিক্ষক সেটা ব্যবহার করছেন এবং যেখানে যেখানে এটা ব্যবহার হয়েছে, সেখানে সৃজনশীল পরীক্ষার সত্যিকারের উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি মাঠে মারা গেছে।

আমি ঠিক করেছি আমার সহকর্মীদের নিয়ে একটা উদ্যোগ নেব এবং সারা পৃথিবীর উৎসাহী বাংলাদেশি তরুণদের সাহায্য নিয়ে এই দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে অসংখ্য অসাধারণ সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করার ব্যবস্থা করে দেব। (যারা সাহায্য করতে চায় তাদের জন্যে বলছি, এর কাজ চলছে, সময় হলেই crowd sourcing এর জন্যে ডাক দেওয়া হবে।)

ভালো প্রশ্ন না হয়ে সাদা মাটা প্রশ্ন একটা বড় সমস্যা ছিল। এখন অন্যান্য সমস্যার তুলনায় এই সমস্যাটাকে অনেক ছোট সমস্যা মনে হচ্ছে! যেহেতু এই দেশের প্রায় সব মানুষের ছেলেমেয়েরাই আজকাল স্কুলে লেখাপড়া করে তাই সবাই ব্যাপারগুলো জানে। একটা হচ্ছে, পাইকারিভাবে সবাইকে পাশ করিয়ে দেওয়া, এতে পাস করার সংখ্যাটা বাড়ে কিন্তু লেখাপড়া তো বাড়ে না। আমরা সবাই প্রায় একই রকম আরেকটা ব্যাপার দেখেছি। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাল্য-বিবাহের সংখ্যা কমিয়ে আনবে, এর জন্যে যে বুদ্ধি বের করেছে এ রকম ফিচলে বুদ্ধি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি! হঠাৎ করে শুনতে পেলাম, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ১৬ তে কমিয়ে আনবে। তাহলে রাতারাতি এই দেশে বাল্য-বিবাহের সংখ্যা নেমে আসতো, কারণ ১৬ থেকে ১৮ বছরের যে মেয়েদের বিয়ে হতো, তারা আর বাল্য-বিবাহের হিসাবে আসত না! আমরা জানি সম্ভবত এই বয়সেই এই দেশে সবচেয়ে বেশি বিয়ে দেওয়া হয়, এক কলমের খোঁচায় তাদের বিয়েটাকে বাল্যবিবাহের বাইরে ঠেলে নিতে পারলে পরিসংখ্যান চোখের পলকে সম্মানজনক হয়ে উঠত! মোটামুটি একই কায়দায় পাসের হার বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং দেখতে দেখতে আমরা দুটি ভয়ংকর ব্যাপার দেখতে পেয়েছি; (এক) পরীক্ষার খাতায় দুই হাতে নম্বর দেওয়া শুরু হয়েছে, (দুই) পরীক্ষার হলে ছেলেমেয়েরা দেখাদেখি শুরু করেছে, শিক্ষকেরা শুধু যে সেটা না দেখার ভান করছেন তা নয়, নিজেরাই প্রশ্নের উত্তর লিখে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আমি জানি আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এটা অস্বীকার করবেন, এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দাবী করবেন, সরকারের অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার হীন ষড়যন্ত্র বলবেন কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। এই দেশের প্রত্যেকের ঘরে স্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়ে আছে, এই দেশের প্রত্যেকে এটা জানে!

সরকার আর স্কুলের শিক্ষক, প্রচ্ছন্ন সমর্থনের এই দুটি ব্যাপারের পাশাপাশি আরও একটি ঘটনা ঘটে চলেছে, সেটি হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস। এই প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করার জন্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয়া বা ফেসবুক বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা শুনে আমরা বুঝতে পারছি আসলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্ন ফাঁসের আসল বিষয়টিই এখনো ধরতে পারেননি। মোবাইল ফোন বা ফেসবুক ব্যবহার করা হয় ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন বিতরণ করার জন্যে, যদি প্রশ্নটি ফাঁস না হয় তাহলে এটা কেউ বিতরন করতে পারে না। প্রশ্নটি ফাঁস হয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কারণে। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আমি অনেক চিৎকার করেছি, এভাবে চিৎকার করতে ভালো লাগে না। এবারে পিএসসির প্রশ্নফাঁসের পর সবাই চিৎকার শুরু করেছে। আশা করছি, এবারে হয়তো বিষয়টার একটা নিস্পত্তি হবে। যদি না হয় তাহলে সবাইকে নিয়ে পথে নেমে আসা ছাড়া আমাদের আর কিছু উপায় থাকবে না।

কীভাবে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় আমি তার খোঁজ নিয়েছি, এখানে অনেকগুলো ধাপ এবং প্রত্যেকটা ধাপ থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে। যেমন একটা দল প্রশ্ন করেন, অন্য একটা দল প্রশ্ন সমন্বয় করেন, অন্য আরেকটা দল প্রশ্ন টাইপ করেন, অন্য আরেকটা দল প্রুফ দেখেন, অন্য আরেকটা দল প্রশ্ন ছাপান, অন্য দল প্রশ্ন প্যাকেট করেন, অন্য আরেকটা দল বিতরণ করেন! কাজেই এই পদ্ধতিটা যতক্ষণ পর্যন্ত পাল্টে না দেওয়া হচ্ছে, প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থেকেই যায়।

এর বাইরে আরো একটা ব্যাপার আছে, পাবলিক পরীক্ষার এই প্রশ্নগুলোতে পরীক্ষা দেয় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে। যে প্রশ্নে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেয় তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কী হতে পারে? কাজেই যারা এই প্রশ্ন করেন, সমন্বয় করেন তাদেরকে কী ঠিক তার সমান গুরুত্ব দিতে হবে না? কিন্তু তাদেরকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয় না, শুনেছি সাত আটশ থেকে হাজার খানেক টাকা সম্মানী দেওয়া হয়। গতবার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পর তদন্ত কমিটি আমার সাথে কথা বলতে এসেছিল, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, যারা প্রশ্ন করবেন তাদের জন্যে হোটেল সোনারগাঁয়ের একটা ফ্লোর ভাড়া করে সেখানে সবাইকে সপ্তাহ খানেক বা সপ্তাহ দুয়েক রেখে দিতে, যেন তারা নিশ্চিতভাবে পুরো সময়টা থেকে চমৎকার প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন। তদন্ত কমিটির সদস্যরা সবাই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন, তারা ভেবেছিলেন আমি ঠাট্টা করছি - আমি কিন্তু একেবারেই ঠাট্টা করিনি। আমলারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করবেন, কিন্তু শিক্ষকদের জন্যে এক পয়সাও খরচ করতে রাজি নন!

৩.

লেখাপড়ার জন্যে পরীক্ষার পরের বিষয়টা হচ্ছে ভালো পাঠ্যবই - আসলে বলা উচিৎ খু-উ-ব ভালো পাঠ্যবই। খুব ভালো পরীক্ষা নিতে যে রকম বাড়তি টাকা লাগে না ঠিক সেরকম খুব ভালো পাঠ্যবই তৈরি করতেও আসলে খুব বেশী বাড়তি টাকা লাগে না। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন এই দেশের ছেলেমেয়েরা কেউ প্রাইভেট পড়ত না, কোচিং শব্দটার তখনো জন্মও হয়নি। যদিবা কখনো কাউকে প্রাইভেট পড়তে হত, তাহলে সেই কাজটাও করা হতো খুবই ‘প্রাইভেট’ ভাবে, অর্থাৎ খুবই গোপনে, কারণ এটাকে মোটেও সম্মানজনক ভাবা হতো না। স্কুলে স্যাররা যদি ভালো না হতেন তাহলে নিজেদেরকেই বইটা ভালো করে পড়তে হতো।

কাজেই, বইটা যদি ভালো হয় তাহলে পরিশ্রমী ছেলেমেয়েরা ভালো স্কুল, ভালো শিক্ষকের অভাবটুকু ভালো পাঠ্যবই দিয়ে পূরণ করে নিতে পারে। ভালো বই বলতে কী বোঝানো হয় সেটা দেখার জন্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলের পাঠ্যবইয়ের সাথে ইংরেজি মিডিয়াম (ও লেভেল, এ লেভেল) স্কুলের পাঠ্যবইগুলো একবার তুলনা করতে বলব।

আমাদের দেশের শিক্ষাবিদদের ওরকম বই লেখার ক্ষমতা নেই আমি সেটা একবারও বলছি না, অবশ্যই আছে। কিন্তু আসলে সেভাবে উদ্যোগটা নেওয়া হয় না। আজকাল জাতীয় পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়া যায়, সেই বইগুলো দেখলে চোখে পানি এসে যায়, এত অযত্নে সেই বইগুলো তৈরি করা হয়েছে যে অবাক হয়ে যেতে হয়। এইচ.এস.সি. এর নূতন সিলেবাসে নূতন বই বের হয়েছে, কিন্তু যার সাথে কথা বলি সেই আমাকে জানায় নূতন সিলেবাসে বইটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যে, বিষয়টা বুঝতে হলে আগের বইগুলো পড়তে হয়। তাহলে নূতন বই লিখে লাভ কী হল ?

যারা দুর্বল ছাত্র, আত্মবিশ্বাসহীন ছাত্র, তারা সম্ভবত আরো কিছুদিন প্রাইভেট পড়বে, কোচিং পড়বে, কিন্তু যদি অসাধারণ কিছু পাঠ্যবই থাকে, তাহলে দেশের অনেক পরিশ্রমী ছেলেমেয়ে হয়তো এই পাঠ্যবই পড়েই লেখাপড়া করে ফেলতে পারবে। স্কুলে ভালো শিক্ষক না থাকলেও একটা ভালো পাঠ্যবই দিয়ে পরিশ্রমী ছেলেমেয়েরা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে!

তবে পাঠ্যবই নিয়ে কথা বলতে হলে আমি সব সময়েই এক জায়গায় এসে খুব আনন্দ পাই, সেটি হচ্ছে বছরের শুরুতে সব ছাত্রছাত্রীদের হাতে নূতন বই তুলে দেওয়া। প্রতি বছর যে সংখ্যক পাঠ্যবই ছাপানো হয়, আমি হিসাব করে দেখেছি সেগুলো একটার পর আরেকটা বসানো হলে পুরো পৃথিবীটা তিন বার পাক খেয়ে আসবে! ছোট ছোট শিশু-কিশোরেরা যখন তাদের নূতন বইগুলো বুকে চেপে ধরে হাসি মুখে বাসায় ফিরে যায় তার থেকে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না।

৪.

ভালো লেখাপড়ার জন্যে ভালো পরীক্ষা আর ভালো পাঠ্যবইয়ের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখনো সবচেয়ে জরুরি বিষয়টার কথা বলা হয়নি। সেটি হচ্ছে ভালো শিক্ষক। যখনই আমি একটা ভালো স্কুলের কথা শুনি, তখনই আমি জানি নিশ্চয়ই সেখানে ভালো শিক্ষক আছেন। যে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জীবনে একজন ভালো শিক্ষক পেয়েছে তার জীবনের একটুখানি হলেও পরিবর্তন হয়েছে।

ভালো একটা পরীক্ষা কিংবা খুব ভালো কিন্তু পাঠ্যবই ইচ্ছে করলেই পাওয়া সম্ভব, কিন্তু ভালো শিক্ষকের বেলায় সেটি সত্যি নয়। আমরা চাইলেই রাতারাতি দেশের সব স্কুলের জন্যে ভালো ভালো শিক্ষক হাজির করতে পারব না।আশা করে আছি শিক্ষকদের জন্যে আলাদা বেতন স্কেল হবে এবং সেই স্কেলটা এত লোভনীয় হবে যে দেশের সেরা ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহ নিয়ে শিক্ষক হবে। শুধু বেতন স্কেল নয়, আমি আশা করছি, পাশাপাশি তাদেরকে সম্মানটুকুও দেওয়া হবে। আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, প্রাইমারি স্কুলের সাধারণ শিক্ষকেরা এই দেশে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি! একজন শিক্ষককে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি বলব এটা কীভাবে সম্ভব ?

৫.

জোট সরকার সরে যাবার পর এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা বেশ ভালো ভাবে শুরু হয়েছিল। পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে বিষয়গুলো সরিয়ে দেয়া হয়েছিল সেগুলো ঠিকভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। শিক্ষানীতি করা হয়েছিল, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে দেশে শিক্ষা নিয়ে একটা উৎসাহের ভাব ছিল। যখনই জরিপ করা হতো, দেখা যেতো জনপ্রিয়তার শীর্ষে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী। আমি নিজেও পুরো বিষয়টা নিয়ে খুব উৎসাহী ছিলাম।

তারপর ধীরে ধীরে কোথায় জানি এই গোলমালটা শুরু হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে পুরো লেখাপড়ার বিষয়টিতে একটা গোজামিল দেওয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষানীতিতে নেই তারপরও এই দেশের ছেলেমেয়েদের উপর জোর করে বাড়তি পাবলিক পরীক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। (সে জন্য দিন-রাত সবার কাছে গালাগাল শুনি, ছোট ছোট শিশুরা, তাদের বাবামায়েরা আমাকে অভিশাপ দেন।) যদি এটা অনেক সুফল নিয়ে আসত তাহলে কেউ কিছু বলত না, সবাই মেনে নিত।

কিন্তু তা ঘটেনি। বাড়তি পরীক্ষার চাপে ছোট ছোট শিশুদের জীবনের সব আনন্দ মাটি হয়ে গেছে। পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে, কোথাও কোথাও শিক্ষকেরা নিজেরা প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীদের পৌঁছে দিচ্ছেন। পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পর শিক্ষক অভিভাবকেরা সমান উৎসাহে সেই প্রশ্ন বের করে তাদের ছাত্রছাত্রী কিংবা সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। শিশুরা অবাক হয়ে দেখছে তাদের শিক্ষকেরা কিংবা তাদের বাবা মায়েরা এক ধরনের অসৎ মানুষ। সেই শিক্ষক কিংবা বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের সামনে কেমন করে মুখ দেখান ?

আমি যখন পি.এইচ.ডি. করছিলাম, তখন আমাদের মাথায় নানা ধরনের আইডিয়া কাজ করতো, গবেষণা করতে করতে আমরা সবাই নিজেদের সেইসব আইডিয়া কাজে লাগানোর চেষ্টা করতাম, কোনো কোনো আইডিয়া কাজ করতো, কোনো কোনোটা করতো না। আমার প্রফেসর তখন আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, সেটা আমি সারাজীবন মনে রেখেছি। আমাকে বলেছিলেন, তোমার আইডিয়া হচ্ছে একটা ঘোড়ার মতন, যতক্ষণ লাফঝাপ দিচ্ছে সেটা নিয়ে নাচানাচি করো - সমস্যা নেই। কিন্তু যদি দেখো ঘোড়া মরে গেছে খবরদার ওটাকে নিয়ে টানাটানি করো না, যত তাড়াতাড়ি পার ওটাকে কবর দেবে!

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির কিছু কিছু ঘোড়া (পি.এস.সি. পরীক্ষা, জে.এস.সি. পরীক্ষা) মরে গেছে। শুধু তাই নয়, মৃতদেহ থেকে রীতিমত দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। এখন যত দ্রুত সম্ভব এগুলোকে কবর দিতে হবে !

না, বাংলাদেশ মারা যায়নি !

১।

পত্রিকায় একটা খবরের শিরোনাম দেখে আমি রীতিমত চমকে উঠেছিলাম, শিরোনামটি হচ্ছে বাংলাদেশ হচ্ছে মৃতদের দেশ। আমার চোখ কচলে শিরোনামটি দ্বিতীয়বার পড়তে হল, ইংরেজী শিরোনামটির বাংলায় সঠিক অনুবাদ করলে তার অর্থ হয় আরো ভয়ানক, "বাংলাদেশ হচ্ছে মৃত চিন্তাভাবনার দেশ।" আমি খুবই অবাক হলাম, এই দেশে থাকি, খাই, ঘুমাই, দেশের খবরাখবর রাখার চেষ্টা করি, হঠাৎ কেমন করে দেশের সব রকম চিন্তা ভাবনা মরে গিয়েছে জানতেই পারলাম না! আমি তখন খবরের ভেতরের অংশ পড়ার চেষ্টা করলাম, তখন বুকে পানি ফিরে এলো। উক্তিটি একজন ব্রিটিশ লেখকের। লেখক তরুণ এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর এরকম একটা মন্তব্য করার অধিকার রয়েছে বলে মনে করেন, কারণ তিনি বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত (এরকম একটা কঠিন শব্দ লিখছি বলে ক্ষমা চাই কিন্তু আমি সঠিক শব্দটা লিখতে চাই, জিয়া হায়দার রহমান নামের এই তরুণ লেখকের পরিচয় দিতে তাঁর সম্পর্কে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে)। আমি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে হলে কী ধরণের শব্দ চয়ন করে কী ধরণের অসম্মানজনক কথা বলা একই সাথে ফ্যাশন এবং বুদ্ধিজীবীদের আচরণ হয় সেটি আমার থেকে ভালো করে কেউ জানে না। আমি যে ১৮ বছর দেশের বাইরে ছিলাম তখন বাংলাদেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে যেটি আমাকে আহত করেছে, বিচলিত করেছে এবং ক্রুদ্ধ করে তুলেছে, কিন্তু দেশের বাইরে থেকে আমি একটিবারও নিজ দেশের সমালোচনা করিনি। আমার মনে হয়েছে দেশের বাইরে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আরামে থেকে দেশের সমালোচনা করার আমার কোন অধিকার নেই! যখন দেশে ফিরে এসেছি শুধু মাত্র তখনই আমার নিজের দেশের সমালোচনা করার অধিকার হয়েছে বলে মনে হয়েছে - তখন লেখালেখি করেছি, চেঁচামেচি করেছি, পথে ঘাটে বসে থেকেছি, আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। (এখন এই দেশে আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না, সেরকম মানুষের সংখ্যা যে কোন হিসেবে ঈর্ষনীয়!)

কিন্তু একজন মানুষ যদি বাংলাদেশী না হয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত হয় এবং মানুষটি যদি লেখালেখির জগতে খুব অল্প বয়সে অনেক সুনাম অর্জন করে থাকেন তাহলে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার মন্তব্য সবাইকে হজম করতে হবে। খবরের কাগজে দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং বড় বড় অধ্যাপকেরা সেটা বেশ ভালোভাবে হজম করেছেন।

"বাংলাদেশ হচ্ছে মৃত চিন্তাভাবনার দেশ" এই শিরোনামের খবরের ভেতরের অংশ আমি পড়ি নি। কান এবং চোখের মাঝে একটা খুবই মৌলিক পার্থক্য আছে, কানের কোন পাতি নেই তাই কানের কাছে কেউ কিছু বললে সেটা না চাইলে শুনতে হয়। চোখের পাতি থাকে তাই আমি যদি কিছু দেখতে না চাই চোখের পাতি ফেলে চোখ বন্ধ করে ফেলতে পারি। তাই জিয়া হায়দার রহমান নামের অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং বিখ্যাত সেই তরুণ লেখকের অত্যন্ত গুরুত্মপূর্ণ সেই বক্তব্যটি আমি পড়ে দেখা প্রয়োজন মনে করিনি, চোখ বন্ধ করে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে ফেলেছি। এবং কিছুক্ষণের মাঝে পুরো বিষয়টি ভুলে গেছি।

কিন্তু ডিসেম্বরের ৯ তারিখ প্রথম আলোতে শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আবুল মকসুদের লেখা একটা প্রবন্ধ "চিন্তা চেতনায় মৃত বা বন্ধ্যা ভূখণ্ড" দেখে আমি আবার চমকে উঠলাম - একই ধরণের শিরোনাম এবং এবারে লেখক কোন বিদেশী নন, লেখক আমাদের বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী। আমি লেখাটি পড়ে দ্বিতীয়বার চমকে উঠলাম কারণ এই লেখাটিতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে বিখ্যাত এবং তরুণ লেখক জিয়া হায়দার রহমান যেটা বলেছেন সেটা সত্যি - আসলেই আমাদের দেশের চিন্তা ভাবনা মরে গেছে, বাংলাদেশ চিন্তা ভাবনার জন্ম দিতে অক্ষম একটি মৃত ভূখণ্ড! আমি যাদের সাথে সময় কাটাই তারা প্রতি মুহুর্তে নূতন নূতন চিন্তা ভাবনা করে, এখন তাহলে কী আমার তাদেরকে বলতে হবে তোমাদের চিন্তা ভাবনা মৃত? তোমরা বন্ধ্যা দেশের নিষ্ফল কারিগর? তোমরা এই দেশ পরিত্যাগ করে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা কর, সেই সব দেশে গিয়ে হোটেলে বাসন ধোয়ার ফাঁকে ফাঁকে বুদ্ধি বৃত্তির চর্চা কর, কারণ এই দেশে বুদ্ধি বৃত্তির কোন স্থান নেই ? চিন্তা ভাবনার কোন অস্তিত্ব নেই ?

আমার মনে হল আমার আশে পাশে যারা থাকে তাদেরকে এতো কঠিন একটা কথা বলার আগে আমার সম্ভবত বিষয়টা আরেকটু তলিয়ে দেখা দরকার। তখন আমাকে পুরানো পত্রিকা (ডিসেম্বর ২০১৪, ডেইলি স্টার) খুঁজে বিখ্যাত তরুণ লেখক জিয়া হায়দার রহমানের আসল বক্তব্যগুলো পড়তে হলো। প্রথমে আমি ছোট একটা ধাক্কা খেলাম, তিনি বলেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছেন দুজন মহিলা, নিজেদের যোগ্যতায় নয়, মৃত ব্যক্তিদের ছায়ায়! (যে দেশে রাজা রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা থাকে সেই দেশের মানুষ যখন এরকম কথা বলেন তখন আমি কৌতুক অনুভব করি - যাই হোক সেটা ভিন্ন কথা) তবে "দুই মহিলা" কিংবা "দুই বেগম" এর তত্ব অবশ্যি মৌলিক কথা নয়, পশ্চিমা দেশের পত্র পত্রিকা শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গে কথা বলতে হলে এভাবে ব্যাখ্যা করে এবং পশ্চিমা পত্র পত্রিকা পড়তে অভ্যস্ত মানুষ কিংবা বুদ্ধিজীবীরাও এই ভাষায় কথা বলতে আরাম বোধ করে। তারা নিশ্চয়ই ভাবেন, এতো বড় নামী দামী পত্রিকা যেহেতু এই ভাষায় লিখে সেটা তো নিশ্চয়ই ভুল হতে পারে না!

যাই হোক আমি বিষয়টা একটু অন্যভাবে দেখানোর চেষ্টা করি। ধরা যাক শেখ হাসিনার নাম শেখ হাসান - অর্থাত তিনি মহিলা নন পুরুষ, বঙ্গবন্ধুর কন্যা নন, বঙ্গবন্ধুর পুত্র সন্তান।

এবং ধরা যাক খালেদা জিয়ার নাম খালেদ রহমান, অর্থাত তিনি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী নন, জিয়াউর রহমানের ভাই কিংবা অন্য কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত একজন পুরুষ মানুষ। ধরা যাক এই দুজন পুরুষ মানুষই একাধিকবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ধরা যাক শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া যে ভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বার্তা বলেন শেখ হাসান এবং খালেদ রহমান নামে এই দুজন কাল্পনিক পুরুষ প্রধানমন্ত্রী হুবহু একই ভাবে কথা বার্তা বলেন। তাহলে কী ইকোনমিস্ট নামের বিখ্যাত পত্রিকা তাদের আচার আচরণকে ব্যাখ্যা করার জন্যে "দুই পরুষের" কর্মকান্ড এরকম ব্যবহার করতো? বিখ্যাত তরুণ লেখক জিয়া হায়দার রহমান এই দুজন মানুষকে বোঝানোর জন্যে "দুই পরুষ" শব্দটা ব্যবহার করতেন? কিংবা শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আবুল মকসুদ কী তাদের দুইজনকে "দুই পরুষ" বলতেন? আমি লাখ তাকা বাজী ধরে বলতে পারি তারা এই দুজনকে তখন "দুই পুরুষ" কিংবা "দুই সাহেব" বলতেন না। দুই "প্রধানমন্ত্রী" বলতেন।

কিন্তু শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়াকে বোঝানোর জন্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সবাই "দুই মহিলা" বা "দুই বেগম" শব্দ ব্যবহার করেন। তাদের রাজনৈতিক পরিচয়, তাদের প্রধানমন্ত্রীত্ব কিছুই কারো চোখে পড়ে না - তাদের চোখে পড়ে যে তারা দুজন মহিলা!

একাত্তরে আমার বাবা মারা যাবার পর আমার সাদাসিধে মা যদি আমাদের দায়িত্ব না নিতেন আমরা কোথায় ভেসে যেতাম জানি না! বিয়ে করার পর আমি প্রথমবার একজন মহিলাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং মহিলাদের কী ধরণের শক্তি কিংবা সাহস থাকে টের পেয়েছি। কর্মজীবনে মহিলাদের সাথে কাজ করেছি এবং এখন অসংখ্য ছাত্রী এবং সহকর্মীদের দেখে মুগ্ধ হয়েছি! আমি খুব ভালো করে জানি টিটকারী করার জন্যে মহিলা শব্দটা আবিষ্কার করা হয়নি। তাই যখন কাউকে (কিংবা কোনো বিখ্যাত সংবাদপত্রকে) দেখি একজন মানুষের হাজারটা পরিচয়ের মাঝে তার "মহিলা" পরিচয়টাকেই খারাপ কিছুকে প্রকাশ করার জন্যে ব্যবহার করা হয় তখন আমার মেজাজ খারাপ হয়। মেজাজ খারাপটা আমি নিজের ভেতরেই রাখি কিন্তু যখন দেখি শ্রদ্ধেয় আবুল মকসুদের মতো মানুষেরাও একই কথা বলেন তখন আমি এক ধরণের বেদনা অনুভব করি। আমার মনে হয় মেয়েদেরকে জানানো উচিৎ সবাই এভাবে ভাবে না - অনেকেই তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে প্রস্তুত।

২।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র তাই সোজাসুজি কথা বললে সেটা বোঝা আমার জন্যে সহজ হয়। সংখ্যা দিয়ে কিংবা উদাহরণ দিয়ে কিছু বলা হলে সেটা ধরতে পারি, ঢালাও ভাবে কিছু বলা হলে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে যাই।

বিখ্যাত তরুণ লেখক জিয়া হায়দার রহমান এবং শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আবুল মকসুদের লেখা পড়েও আমি একটু বিভ্রান্ত হয়েছি কারন দুজনেই পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যতে বিন্দুমাত্র আলো দেখতে পাচ্ছেন না! (লেখার এই অংশটুকু আমাকে কয়েকবার পড়তে হয়েছে! কোনো মানুষের পক্ষে এতো নিশ্চিত ভাবে একটা দেশ সম্পর্কে এরকম একটা ভয়ংকর কথা বলা সত্যিই সম্ভব সেটি নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয়নি।) আমাদের দেশ সম্পর্কে এরকম একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন হেনরী কিসিঞ্জার, যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রচেষ্টাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়ে গেল তখন হেনরী কিসিঞ্জার আমাদের দেশকে ভবিষ্যতের একটি তলাবিহীন ঝুড়ি আখ্যা দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে খুব সমীহ করে চলে এবং নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন অনেকবার বলেছেন সামাজিক সূচকের অনেক দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন ভারত থেকে অনেক এগিয়ে আছে! হেনরী কিসিঞ্জার এখন কী এই কথাগুলো জানেন ?

যাই হোক একটি দেশের ভবিষ্যতে "বিন্দুমাত্র আলো নেই" এটি একটি অত্যন্ত কঠিন কথা। আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি বাংলাদেশের হৃৎস্পন্দন শুনি তারা জানি এটি কিছুতেই সত্যি হতে পারে না! এই দেশের সমস্যার কোনো শেষ নেই - কিন্তু এ কথাটি পুরোপুরি সত্যি যে কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক বাংলাদেশ আসলে মাথা তুলে দাঁড়াতে যাচ্ছে!

৩।

বিখ্যাত তরুণ লেখক জিয়া হায়দার রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের সামনে ঘোষণা দিয়েছেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে চিন্তা ভাবনায় মৃত একটি দেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বা কোনো শিক্ষক সেটার প্রতিবাদ করে কিছু বলেছেন সেটা চোখে পড়েনি। বরং শ্রদ্ধেয় আবুল মকসুদ সেই ছোট ঘোষণার পক্ষে অনেক বড় একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন স্কুলে "ব্যাখ্যা কর" বলে গভীর জ্ঞানের একটা লাইন লিখে দেয়া হতো। আমরা শুরু করতাম এভাবে, "আলোচ্য অংশটি অমুক লেখকের অমুক লেখা থেকে নেয়া হয়ছে" তারপর সেই একটি লাইনকে অনেক ফুলিয়ে ফাপিয়ে বড় করে লিখতাম। শ্রদ্ধেয় আবুল মকসুদের লেখাটি পড়ে আমার হুবহু সেই কথাটি মনে হয়েছে। লেখাটি দেখে মনে হয় কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ শ্রদ্ধেয় আবুল মকসুদকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিখ্যাত তরুণ লেখক জিয়া হায়দার রহমানের দুই তিনটি লাইনকে অনেক বড় করে ব্যাখ্যা করার জন্যে, এবং তিনি সত্যিকারের ভালো ছাত্রের মত সেটাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

একজন শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী এভাবে একটা ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলে অনেক তরুণ কমবয়সী ছেলে মেয়ে সত্যি সত্যি সেটা বিশ্বাস করে ফেলতে পারে, তারা মনে করতে পারে সত্যিই বুঝি বাংলাদেশে চিন্তা ভাবনার জন্ম হয় না, সত্যিই বুঝি বাংলাদেশ চিন্তা ভাবনার দিক থেকে মৃত এবং একটি বন্ধ্যা ভূখন্ড। কাজেই আমার মনে হয়েছে আমি নিজে এ ব্যপারে কী ভাবি সেটা একটু বলা দরকার।

আমি আঠারো বছর পাশ্চাত্য দেশে কাটিয়ে এসেছি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্যরকম। ঐ দেশ গুলোতে আমার চিন্তা চেতনা বিকাশের যেটুকু সুযোগ ছিল আমার নিজের দেশে সুযোগ তার থেকে অনেক বেশী। এই দেশে অসংখ্য মানুষ নূতন নূতন চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করছে, আমি শুধুমাত্র আমার একান্ত নিজস্ব চিন্তা ভাবনার একটা তালিকা দেই। প্রায় এক যুগ আগে আমরা কয়েকজন ভাবছিলাম আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যেন আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে যেতে পারে সেরকম একটা ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ? আমাদের সাথে যে তরুণ ছেলেময়েরা কাজ করছে তারা গণিত অলিম্পিয়াডকে গণিত উৎসবে পরিণত করে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো দেশে ক্লাশ থ্রীয়ের বাচ্চাদের নিয়ে গণিত অলিম্পিয়াড হয় না - আমাদের দেশে হয় এবং আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের কর্তা ব্যক্তিরা আমাদের এই চমকপ্রদ আইডিয়ার কথা শুনে হতবাক হয়ে যান।

আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সাথে কাজ করি। কয়েক বছর আগে তাদেরকে বলেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি রেজিষ্ট্রেশানের যন্ত্রনা কমানোর জন্যে মোবাইল টেলিফোনে এস এম এস করে পুরো প্রক্রিয়াটি কী শেষ করা সম্ভব ? আমার "বাচ্চা" সহকর্মীরা এই দেশের মানুষের জন্যে মোবাইলে ভর্তি রেজিষ্ট্রেশানের ব্যবস্থা তৈরী করে দিয়েছে। এটি মৃত আইডিয়া নয় - বাংলাদেশের প্রায় সব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এই প্রক্রিয়া ব্যবহার হয়।

আমার সাথে ছাত্রছাত্রীরা কাজ করে - আমি যখন তাদেরকে বলি যে, "এরপর আমরা একটা ড্রোন বানাবো", তারা আমাকে ড্রোন বানিয়ে দেয়, যখন বলি "একটা রবোট বানালে কেমন হয়", তারা রোবট বানিয়ে দেয়, যখন বলি, "পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি", তারা পরীক্ষার খাতা দেখা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে এপস বানিয়ে দেয়, যখন বলি "দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্যে সহজ ব্রেইল কী তৈরী করা সম্ভব?", তারা দ্রুত তার একটি সমাধান বের করে আনে। যখন বলি, "পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসকে ঠেকাতে হবে", দেশের নানা ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েরা একশটা আইডিয়া নিয়ে পথে নেমে আসে। আমি যাদের সাথে সময় কাটাই তারা আমাকে নূতন নূতন কী আইডিয়া দিয়েছে, আমি সারাদিন ধরে বলে সেটা শেষ করতে পারব না! যদি এই দেশের অন্যান্য মানুষের অভিজ্ঞতার কথা বলি তাহলে সেটি কী বলে শেষ করা সম্ভব ? কয়েকটা উদাহরণ কী দেব ?

গণজাগরণ মঞ্চের কথা মনে আছে ? একজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায়টি যথাযথ হয়নি বলে এই দেশের তরুণ সমাজ সম্মিলিতভাবে পথে নেমে এসে, সারা দেশ নয় - সারা পৃথিবীতে কী রকম আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার কথা মনে আছে ? সেটি কী চিন্তা ভাবনার জগতের একটি বিপ্লব ছিল না ? পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়। আমাদের দেশে নিজেদের ট্রাইবুনাল তৈরী করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছি, সেটি কী সারা পৃথিবীর জন্যে ভবিষ্যতের একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে না? প্রফেসর ইউনুস তার নূতন নূতন চিন্তা ভাবনা নিয়ে পৃথিবীকে চমৎকৃত করছেন না? তার চিন্তার ক্ষেত্রটি তো বাইরের কোন দেশ নয় - আমাদের বাংলাদেশ। ঠিক সেরকম স্যার ফজলে হোসেন আবেদ তার বিশাল প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের নানা কর্মকান্ড দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিচ্ছেন না ? সেটি কী গতানুগতিক কাজ নাকী নূতন চিন্তাভাবনার বাস্তবায়ন ? দেশের অসংখ্য এন জি ও নিজেদের মত কাজ করে যাচ্ছে, কতো বিচিত্র তাদের আইডিয়া কতো আন্তরিক তাদের কাজকর্ম ? সেগুলো একটাও কী চিন্তা ভাবনার জগতের একটা অবদান হিসেবে বিখ্যাত তরুণ লেখক জিয়া হায়দার রহমান বা শ্রদ্ধেয় আবুল মকসুদের চোখে পড়তে পারে না ? দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের নানা অভিযোগ - কিন্তু দেশের তিন কোটি ছেলেমেয়েদের হাতে বছরের প্রথম দিনে নূতন পাঠ্যবই তুলে দেয়ার পরিকল্পনাটা কী নূতন আইডিয়া নয় ? নানারকম চেষ্টা চরিত্র করে দেশের মেয়েদের দেশের ছেলেদের সাথে সমান হারে লেখাপড়া করানো কী চিন্তা ভাবনার জগতের একটা অবদান মনে করা যায় না ? বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী পৃথিবীর নানা দেশে শান্তি রক্ষা বাহিনী হিসেবে কাজ করে - সেরকম অনেক দেশে বঙ্গবন্ধুর নামে রাস্তা তৈরী হয়েছে, এমন কী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহন করা হয়েছে, সেগুলো কী একটা বন্ধ্যা দেশের পরিচয় ? পৃথিবীর কয়টা দেশ আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের গড়ে তোলা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের মত একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নিয়ে অহংকার করতে পারবে? আর কতো উদাহরণ দেব ?

আমি একবারও বলিনি এই দেশের কোনো সমস্যা নেই - এই দেশে অসংখ্য সমস্যা আছে। অসংখ্য অবিচার অনাচার দু:খ কষ্ট যন্ত্রণা আছে। দেশের অনেক কিছু নিয়ে আমাদের তীব্র ক্ষোভ আছে। অনেক জগদ্দল পাথর আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে, আমরা ঠেলে সরাতে পারি না। কিন্তু তার অর্থ নয় আমাদের দেশ চিন্তা চেতনায় মৃত একটি দেশ, আমরা একটি নিস্ফলা বন্ধ্যা দেশ!

একজন মানুষ তার স্বপ্নের মত বড়। একাত্তরের বাস্তবতায় বাংলাদের স্বাধীন হওয়ার কথা ছিলো না, কিন্তু এই দেশের মানুষ সেই স্বপ্ন বুকে ধারণ করে অচিন্ত্যনীয় আত্নত্যাগ করতে রাজী ছিল বলে আমরা একটা দেশ পেয়েছি। আমার মত ক্ষুদ্র একজন মানুষ এই দীর্ঘ জীবনে যতবার যা কিছু নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমি কেন তাহলে সেই সত্যটি উচ্চকন্ঠে সবাইকে শোনাব না ? যাদের সেই স্বপ্ন দেখার শক্তি, সাহস বা ক্ষমতা নেই তারা যদি অন্যদেরকেও স্বপ্ন দেখতে দিতে না চান কেন তাহলে আমি প্রতিবাদ করব না ?